রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

মাথা নীচু করে নয়, উঁচু করে বাঁচার পরিবেশ চাই

রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা আজ বিভিন্ন দিক থেকে আক্রান্ত। একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির কারণে তাঁদের প্রতিনিয়ত বেতনের ক্ষয় ঘটছে, অপরদিকে এই ক্ষয় রোধ করার যে প্রচলিত ব্যবস্থা, যা বহু লড়াই-এর ফসল, সেই কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা সম্পর্কে রাজ্য সরকার উপেক্ষার মনোভাব গ্রহণ করে চলেছে। বকেয়ার পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এখন ৪২ শতাংশ। একেবারে সর্বনিম্নস্তরের একজন কর্মচারীর প্রতিমাসে ক্ষতি হচ্ছে প্রায় ৩০০০ টাকা। প্রশাসনের উপরের দিকে যাঁরা, তাঁদের ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশী। অথচ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে বার বার বিভিন্নভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও, প্রবল কর্মচারী দরদী (এমন দাবি তাঁরা নিজেরাই গত বিধানসভা নির্বাচনে করেছিলেন) সরকারের কোন হেলদোল নেই। বঞ্চনার ইতিবৃত্ত এখানেই শেষ নয়। একইরকম অনীহা ও এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাব বেতন কমিশন গঠন সম্পর্কেও। আবার শুধুমাত্র আর্থিক পাওনা-গন্ডার দিক থেকেই কর্মচারীরা মার খাচ্ছেন তা-ই নয়, সংগঠন করার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার — সবকিছুর ওপরেই ক্রমান্বয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে চলেছে। 'বদলি' তো এখন সরকারের হাতে সব থেকে বড় অস্ত্র কর্মচারীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য। কর্মচারীরা যাতে প্রতিবাদ করতে না পারে, মুখ খুলতে না পারে, তার জন্য বদলির জুজু দেখিয়ে তাঁদের মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা চলছে। মন্ত্রী থেকে আধিকারিক কেউই স্বীকৃত সংগঠনগুলির সাথে আলোচনায় বসতে চাইছেন না। এক কথায় চূড়ান্ত নৈরাজ্য চলছে রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে। এর সাথে 'গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া'র মত প্রশাসনের বাইরে শাসক দলের হুমকি, আক্রমণ, তোলাবাজি চলছে অবাধে। কর্মচারীদের প্রশাসনিক রক্ষকের ভূমিকা যাঁর পালন করার কথা, তিনি কার্যত ভক্ষকদেরই আড়াল করছেন।

কিন্তু পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক, তাকে মোকাবিলা করাই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঐতিহ্য—আত্মসমর্পণ করা নয়। এই ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে বর্তমান প্রতিকূলতাকে ভেদ করে কর্মচারী স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহ্বান জানালো রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদ্য সমাপ্ত স্টেট কাউন্সিল সভা।

প্রস্তাবক মনোজ কান্তি গুহ

একদিনের এই রাজ্য কাউন্সিল সভা পরিচালনা করে অশোক পাত্র, চুনীলাল মুখার্জী, চন্দন ঘোষ ও কৃষ্ণা বোস-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভার শুরুতেই সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে অশোক পাত্র শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তারপর নীরবতা পালন করা হয়। এরপর সভার শুরুতে সমস্ত কাউন্সিল সদস্যকে দেওয়া এজেন্ডা নোটস্-এর উপর ভিত্তি করে প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ।

প্রস্তাবনার শুরুতেই সাধারণ সম্পাদক সপ্তদশ কাউন্সিলের প্রথম সভায় আগত সকল সদস্যদের উষ্ণ অভিনন্দন জানান। সাধারণ সম্পাদকের প্রাথমিক প্রস্তাবনার উপর ১৮টি জেলা ও ৭টি অঞ্চলের পক্ষ থেকে মোট ২৫ জন আলোচনা করেন। সামগ্রিক আলোচনা গুটিয়ে জবাবী ভাষণ প্রদান করেন যুগ্ম সম্পাদক অসিত কুমার ভট্টাচার্য। সামগ্রিক প্রস্তাবনা ও করণীয় বিষয়গুলি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের পর্যালোচনা ঃ রাজ্যের পরিবর্তিত

জবাবী বক্তব্যে অসিত ভট্টাচার্য

পরিস্থিতিতে বিগত ২৭-৩০ ডিসেম্বর '১৩ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আশোকনগরে সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন পরবর্তীতে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ অনুষ্ঠিত নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় সভায় সপ্তদশ রাজ্য

(চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

২৭ মার্চ ২০১৪

ব্যতিক্রমী ইতিহাস রচনা করলো যৌথ কনভেনশন

কনভেনশনে হল ছাপিয়ে বাইরে উপচে পড়া কর্মচারী জমায়েত।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উপর নজিরবিহীন প্রশাসনিক আক্রমণ ও তীব্র আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগ্রামের রূপরেখা তৈরি করতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, জয়েন্ট কাউন্সিল, স্টিয়ারিং কমিটি, যুক্ত কমিটি, আশা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন (নব পর্যায়)-এর উদ্যোগে ২৭ মার্চ ২০১৪ কলকাতায় মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে অফিস ছুটির পর ৯ দফা দাবিতে যৌথ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে রাজ্য সরকার পোষিত বিভিন্ন সংস্থার কর্মচারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান রাজ্য সরকারের কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী আদেশনামা সমূহ ও গৃহীত পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রাম উদ্বুদ্ধ করেছে আয়োজক অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর আন্দোলন সংগ্রামের রূপরেখা রচনার লক্ষ্যে একমঞ্চে শামিল হতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই শাসকদলের অনুগামীরা বিভিন্ন জায়গায় গায়ের জোরে ট্রেড ইউনিয়ন অফিস দখল, কর্মচারীদের উপর হামলা, বিপুল পরিমাণ আর্থিক জরিমানা ধার্য করা, ক্যাডার ভিত্তিক বদলীর নিয়ম নীতিকে উপেক্ষা করে নেতা-কর্মী-কর্মচারীকে হয়রানিমূলকভাবে যত্রতন্ত্র বদলী করা, কর্মচারীর অর্জিত নিয়োগ নীতিকে বাতিল করে তিন বছরে চাকরীকালের পর স্থায়ীকরণের পদ্ধতিকে নস্যাৎ করা, সর্বস্তরে লোকসেবা আয়োগ (পিএসসি)-এর মাধ্যমে নিয়োগের আদেশনামাকে লঙঘন করে স্থায়ীপদে চুক্তিতে নিয়োগ, ধর্মঘটের অর্জিত অধিকারকে পদদলিত করে ধর্মঘটী কর্মচারীদের বেতন কাটা এবং ডায়াস-নন করে কর্মজীবন থেকে একদিন কমিয়ে দেওয়া, পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় (অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটি)-র অংশের সুপারিশকে কার্যকরী না করে পরিত্যক্ত মহাকরণের অন্ধকার 'কুঠুরিতে' বন্দী করে রাখা, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের দাবিকে উপেক্ষা করা এবং সর্বোপরি ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া রাখার মধ্য দিয়ে দেশের মধ্যে আর্থিকভাবে সবচেয়ে পিছিয়ে এবং অধিকারগত দিক থেকে সবথেকে বিপন্ন রয়েছে এ রাজ্যের কর্মচারী সমাজ। কর্মচারীদের ওপর এই প্রশাসনিক ও আর্থিক আক্রমণকে উস্কে দিতেই রাজ্য প্রশাসনের প্রধান হিসাবে সাংবিধানিক রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য সভায় গণতান্ত্রিক সংগঠনকে ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের কর্মচারী সমাজ প্রতিবাদে মুখর। সামগ্রিক আন্দোলন সংগ্রামের অংশ হিসেবেই রাজ্য প্রশাসনের ছ'টি সংগঠনের আহ্বানে আয়োজিত হল এই যৌথ কনভেনশন।

এই যৌথ কনভেনশন পরিচালনা করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র, ওঃবেঃ গভঃ এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর পক্ষে তপন চক্রবর্তী, আশা-র পক্ষে ভারতী ঘোষ মাইতি, যুক্ত কমিটির পক্ষে অনীত মুখোপাধ্যায়, স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষে স্বপন সাহা এবং জয়েন্ট কাউন্সিলের পক্ষে দেবমাল্য সোমকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন তপন চক্রবর্তী এবং নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সভা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

কনভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অসিত কুমার ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন সরকারের সর্বব্যাপী আক্রমণ, দমন-পীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সারা পশ্চিমবাংলার সমস্ত স্তরের কর্মচারী সমাজ আজ তাই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শামিল হয়েছে। এই কনভেনশন থেকে গৃহীত দাবিসনদ নিয়ে পশ্চিমবাংলার মাননীয়

(দশম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

এ আই এস জি ই এফ-এর ডাকে ৬ মার্চ দাবি দিবস প্রতিপালন

বিগত ৬ মার্চ, ২০১৪ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে পালিত হল দাবি দিবস কর্মসূচী। মাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে মাইক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় সর্বভারতীয় সংগঠনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকাশ্য স্থানে সারাদিনব্যাপী ধর্ণা ও সমাবেশের কর্মসূচীর পরিবর্তে হলসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। তিনি বলেন ৩০-৩১ জানুয়ারি, ২০১৪ নাগপুরে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ সভা থেকে এই কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত হয়। ঐ সভায় আলোচনা হয় যে, ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের আগে দেশের সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশী দুর্দশাগ্রস্ত, তাই এই লড়াইয়ে সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। অভিজ্ঞতার নিরিখেই দেশের প্রধান দুটি দল কংগ্রেস ও বিজেপি সম্বন্ধে মানুষ বীতশ্রদ্ধ। কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ হলেও সুবিধাবাদী এবং সাম্প্রদায়িক দলকে বরাবর প্রশ্রয় দিয়েছে। ব্যাঙ্ক-বীমার বেসরকারীকরণ, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজিসহ একাধিক

সুকোমল সেন

উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করেছে কংগ্রেস। মোদী বনাম রাহুলের প্রচারে নীতির থেকে নেতাকে বড় করে দেখানো হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে নারীদের উপর আক্রমণ যেভাবে উত্তরোত্তর বাড়ছে, সেই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করতে হবে। বর্তমান রাজ্য সরকার ফ্যাসিস্ট কায়দায় সংগঠন ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এছাড়া এই সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে নবান্ন ও খাদ্য ভবনে পোস্টার না মারার নির্দেশ সহ একাধিক কালা কানুন জারি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বৃহৎভাবে প্রতিবাদে নামা হবে। ঐ মঞ্চ থেকেই তিনি ২৭ মার্চ মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে ৬টি সংগঠনের যৌথ কনভেনশনের ঘোষণা করেন, এবং

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে)

১২ই জুলাই কমিটির অষ্টম রাজ্য সাংগঠনিক কনভেনশন সফল হল

শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকদের যৌথ মঞ্চ ১২ জুলাই কমিটির অষ্টম রাজ্য সাংগঠনিক কনভেনশন গত ৮-৯ মার্চ ২০১৪, কলকাতার যাদবপুর বিজয়গড়ে অবস্থিত নিরঞ্জন সদন সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হল। ২০০৭ সালে সপ্তম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর পর কেটে গিয়েছে দীর্ঘ ৭টা বছর এবং বহু পরিবর্তনও ঘটে গিয়েছে এই সময়কালে। সরকার পরিবর্তন ঘটলেও আন্দোলন সংগ্রাম থেমে থাকেনি। আহ্বায়কগণ তাঁদের

সমীর ভট্টাচার্য

বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কলকাতার কেন্দ্রস্থলের হলগুলিতে কনভেনশনের অনুমতি না পাওয়ায় একটু দূরবর্তী স্থানে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত করতে হল।

সকাল ১০-০০ টায় আহ্বায়ক শিবশঙ্কর রায় রক্তপতাকা

তপন সেন

উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অষ্টম রাজ্য সাংগঠনিক কনভেনশনের সূচনা করেন। একে একে মাল্যদান করেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সুকোমল সেন, আহ্বায়ক সমীর ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দ। এরপর

তপন দাশগুপ্ত

সকলে সারিবদ্ধ ভাবে হলে প্রবেশ করেন। রাজ্যের ১৯ টি জেলা থেকে প্রায় নয়শত'র বেশী

(চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

ভয়কে জয় করার অঙ্গীকারে স্মরণীয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস

শ্রমজীবী নারীদের সম অধিকারের দাবীতে প্রতিবছর ৮ মার্চ 'নারী দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। ১৮৬৮ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অধিকারের প্রশ্ন তুলে ধরেন কার্ল মার্কস, কিন্তু এর বিরুদ্ধে সংস্কারবাদীরা প্রস্তাব দেন— নারীদের বাইরের কাজ অপেক্ষা ঘরের কাজে সীমাবদ্ধ থাকাই ভাল। যথারীতি কার্ল মার্কস এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে নারীরা প্রথম সভ্যপদ গ্রহণ করতে পারেন। সর্বপ্রথম নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবীতে ১৮৮৯ সালে প্যারি শহরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে বিশ্ববরেণ্য কমিউনিস্ট

কুমকুম চক্রবর্তী

নেত্রী ক্লারা জেটকিন স্মরণীয় বক্তৃতা দেন। ১৯০৭ সালে জার্মানির স্টুটগার্ডে ও ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দুটি আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন থেকে দু-বারই ক্লারা জেটকিন সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। সেই সময় নারীদের ভোটাধিকার অর্জনের দাবীতে আন্দোলন ছিল

(দশম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার
মার্চ ২০১৪
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
দ্বিচত্বারিংশত্তম বর্ষ □ একাদশ সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

নির্বাচন ‘ডুয়েল-ফাইট’-এর মঞ্চ নয়

দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালনা করে সরকার। আবার সরকার গঠন করতে পারে একমাত্র রাজনৈতিক দলই। আর কোন ধরনের কোন সংগঠন, গোষ্ঠী বা মঞ্চের এই সুযোগ নেই। কোন দেশেরই সংবিধান সে সুযোগ তাদের দেয় না। সরকার গঠনের জন্য যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলই। ফলে মানুষকেও কোন না কোন রাজনৈতিক দলকেই বেছে নিতে হয়, তাঁর বা তাঁদের পছন্দের দল হিসেবে। এর কোন বিকল্প নেই।

তাই নির্বাচনের সময় যখন এসে পড়ে, তখন প্রায় সকলেই কম-বেশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য, ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে ভাবেন, আলোচনা ও মতবিনিময়ে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি যাঁরা অন্যান্য সময়ে ‘রাজনীতি পছন্দ করি না,’ ‘রাজনীতি ভাল নয়’, ‘রাজনীতি থেকে দূরে থাকাই ভাল’ ইত্যাদি মন্তব্য করতে অভ্যস্ত, তাঁরাও অন্তত এই সময়টা ‘রাজনীতি’কে ততটা অস্পৃশ্য মনে করেন না, বরং কিছুটা আগ্রহই প্রকাশ করেন। তাই বাসে, ট্রেনে-হাট-বাজারে, পাড়ার চায়ের দোকানে, অফিস-কাছারিতে, নির্বাচনের আগে-পরে বেশ কিছুদিন ক্রিকেট-ফুটবল, সিনেমা-নাটককে দূরে সরিয়ে রেখে রাজনীতিকেন্দ্রিক আলোচনা সামনে চলে আসে। এই ধরনের ‘মরশুমী’ চরিত্রের আলোচনা গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের পক্ষে মন্দের ভাল। মন্দের ভাল বলার কারণ হল নির্বাচনের মরশুমে যে ধরনের রাজনৈতিক চর্চা, তর্ক-বিতর্ক গণতন্ত্রের আকাশে ঘনীভূত হয়, তা যদি নির্বাচন হোক বা না হোক, সারা বছর ধরে একইভাবে সক্রিয় থাকত, তাহলে নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য উজ্জ্বলতর হত।

রাজনৈতিক চর্চা, তর্ক-বিতর্কে নিজেকে যুক্ত রাখা মানে এটা নয় যে সক্রিয় রাজনীতি করা বা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা নিয়ে ময়দানে নেমে পড়া। সকলেই সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছেন, এটা কোন যুগে, কোন কালেই হয় নি। এমনকি যে সমস্ত দেশে ‘বিপ্লব’ করে ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, সেখানেও নয়। কিন্তু সক্রিয় রাজনীতি না করা এবং রাজনৈতিক চর্চা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা দুটো এক জিনিস নয়। রাজনৈতিক চর্চা মানেই হল রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত নীতি, আইন, সিদ্ধান্ত— যেগুলি, আমরা চাই বা না চাই, আমাদের জীবন-জীবিকার ওপর ভাল-মন্দ বিভিন্ন ধরনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সেগুলিকে নিয়ে আলোচনা, মতবিনিময়, এবং তার ভিত্তিতে মতামত গঠন। যদিও কোন পরিসংখ্যান হাজির করা সম্ভব নয়, কিন্তু সাধারণ উপলব্ধি থেকে সম্ভবত কেউই অস্বীকার করবেন না—ধারাবাহিক রাজনৈতিক চর্চার অভ্যাস, বিশেষত মধ্যবিত্তের মধ্যে কমছে। বাসে, ট্রামে, ট্রেনে একটু কান পাতলে এমন কিছু আলগা, পল্‌কা মন্তব্য কানে আসবেই, যা থেকে ধারাবাহিক চর্চার অভ্যাস যে ক্ষয়িষ্ণু তা বেশ বোঝা যায়।

অথচ ‘মধ্যবিত্ত’-ই একসময় এ বিষয়ে ছিল চ্যাম্পিয়ন। তাঁরা শুধু নিজেদের মতামত গঠন করতেন না, এমনকি সমাজের অন্যান্য অংশ যাঁরা মূলত কায়িক শ্রম করতেন, তাঁদেরও মতামত গঠনে সাহায্য করতেন। তাইতো মধ্যবিত্তকে বলা হত ‘ওপিনিয়ন মেকার’। ফলে সেই সময়েও, যাঁরা সক্রিয় রাজনীতি করতেন না, বা করার সুযোগ অথবা ইচ্ছা কোনটাই ছিল না, তাঁরাও স্বচ্ছন্দে ‘ওপিনিয়ন মেকারের’ কাজটা করতেন।

ধারাবাহিক রাজনৈতিক চর্চা থেকে মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্নতা যে ক্রমশই দৃশ্যমান হচ্ছে, তাও কার্যকারণ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটছে তা আদৌ নয়। পরিকল্পিতভাবে বাহ্যিক মনস্তাত্ত্বিক বল প্রয়োগ করে মধ্যবিত্তকে দৈনন্দিন রাজনৈতিক চর্চার বৃত্তের বাইরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। মনস্তাত্ত্বিক স্তরে প্রযুক্ত এই বাহ্যিক বলটি হল ‘বি-রাজনীতিকরণ’। রাজনীতি যেহেতু সমাজকেন্দ্রিক, তাই রাজনৈতিক চর্চায় অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত মানুষ হয় সমাজমুখী। আর রাজনৈতিক চর্চা রহিত মধ্যবিত্ত মানস হয় আত্মমুখী। আত্মমুখিনতা জন্ম দেয় বিচ্ছিন্নতার, একের প্রতি অপরের সহানুভুতির অভাবে দুর্বল হয় একতা। সর্বোপরি হ্রাস পায় চিন্তার গভীরতা এবং যে কোন সমস্যার মূলে গিয়ে তার কারণ খুঁজে বের করার ধৈর্য। বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণাবলীর থেকে অনেক সময়েই বেশী প্রাধান্য পায় বাইরের চাকচিক্য। উপরোক্ত বি-রাজনীতিকরণের দাওয়াই গেলানোর যে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে, তা অনেকটাই স্পষ্ট এবারের প্রাক্-নির্বাচনী পর্বে। সামগ্রিকভাবে যে প্রচারের ঝড় চলছে, তাতে কার্যত রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত নীতি, সিদ্ধান্ত, আইন ইত্যাদির কোন স্থান নেই। অথচ এযাবৎকাল এগুলিই ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির উপর ভিত্তি করে, পর্যালোচনা করে, মত বিনিময় করে মানুষ পছন্দ, অপছন্দ বাছাই করতেন। আজ যে আলোচনা / প্রচারের ‘হাইপ’ তোলা হচ্ছে, তার সবটাই দু’জন ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সমগ্র প্রচারের অভিমুখটা এমন যেন, এই দু’জনের মধ্যে কোন একজন বেছে নিলেই নির্বাচকমণ্ডলীর দায়িত্ব শেষ। বাকি কিছু ভাবার কোন প্রয়োজন নেই।

অথচ এবারের নির্বাচনে তো ‘ইস্যুর’ অভাব ছিল না! খাদ্যশস্য সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, পাহাড় প্রমাণ একের পর এক দুর্নীতি, গরীব মানুষের সংখ্যাই বিপুল বৃদ্ধি অথচ সংখ্যাতত্ত্বের কারচুপি করে গরীব মানুষের সংখ্যা কম করে দেখানো, খাদ্য সুরক্ষার নাম করে গরীব মানুষের একটা অংশকে সস্তায় খাদ্যশস্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা, ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে কৃষকের আত্মহত্যা, শিল্পের মন্দা, কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস, কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরে দীর্ঘদিন নিয়োগ বন্ধ থাকা, ব্যাঙ্ক-বীমা সহ রাষ্ট্রয়ত্ত ক্ষেত্রকে দেশী-বিদেশী বেসরকারী পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া, জল-জঙ্গল, খনি, সহ দেশের সমস্ত সম্পদকে মুনাফাখোরদের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করা, পেনশন বেসরকারীকরণ সহ এমনই আরও অনেক বিষয় থাকতে পারতো ইস্যু হিসেবে। অদ্ভুতভাবে এর কোনটিকেই আলোচনায় বস্তুনিষ্ঠভাবে আনার সুযোগই দেওয়া হচ্ছে না।

আমাদের মনে আছে, গত শতাব্দীর আশির দশকে ৭৬ কোটি টাকার বোফর্স কেলেঙ্কারি নিয়ে নির্বাচনের আগে ঝড় বয়ে গেছিল। অথচ আজ কয়েক লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতিকেও কৌশলে আড়াল করা হচ্ছে। এটাও বলা হচ্ছে না, কেন্দ্রে বর্তমান শাসকদল এবং প্রধান বিরোধী দল উভয়েই দুর্নীতির পাঁকে ডুবে রয়েছে। এমনকি প্রধান বিরোধী দল থেকে যাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা বলা হচ্ছে, তাঁর হাত গণহত্যায় রঞ্জিত। তিনি যে গণহত্যার নায়ক, তা না বলে তাকে ‘বিকাশ পুরুষ’ হিসেবে প্রোজেক্ট করা হচ্ছে। তথাকথিত বিকাশের ভুক্তভোগী গুজরাটের দরিদ্র মানুষের জীবন-যন্ত্রণার কথাও সামনে আনা হচ্ছে না।

অর্থাৎ নীতি যা ছিল, তা-ই থাকবে। শুধু দরকার একজন দুর্বল মানুষের (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) পরিবর্তে সবল মানুষ। আমরা যাঁরা এই সময়ে ধারাবাহিকভাবে না হলেও, মরশুমী রাজনৈতিক চর্চায় ঢুকে পড়েছি, আমাদের কর্তব্য হল ‘মিডিয়া হাইপ’-এ প্রভাবিত না হয়ে জীবনের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে প্রোজেক্টেড মুখগুলি যে দলগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করছে, তাদের এযাবৎকালের গৃহীত নীতি ভূমিকাকে যাচাই করা। তাহলেই উপলব্ধি করব, শুধু নেতার পরিবর্তন মুখ্য নয়, প্রয়োজন নীতির পরিবর্তন। এমন নীতি যা মূল্যবৃদ্ধি রদ করবে, কৃষককে ফসলের দাম দেবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করবে, খাদ্যের অধিকারকে নিশ্চিত করবে, দেশের সম্পদকে রক্ষা করবে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম্প্রীতি বজায় রাখবে। ফলে ভবিষ্যতে ধারাবাহিক চর্চার আকাঙ্ক্ষা পোষণ সহ বর্তমানে অন্তত মরশুমী রাজনৈতিক চর্চাও আবর্তিত হোক নীতিকেন্দ্রিক, নেতাকেন্দ্রিক নয়। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিও হোক ব্যক্তি, নেতা বা নেত্রী নয়—নীতি। বিকল্প নীতি— জীবন ও জীবিকার সুরক্ষার জন্য। □

২৭ মার্চ, ২০১৪

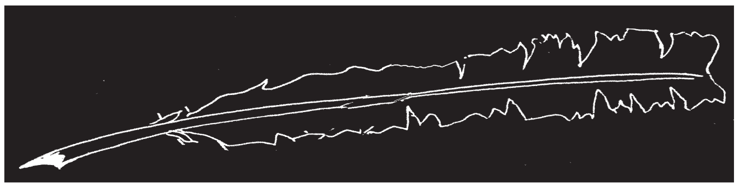

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। কমিশন ইতোমধ্যেই নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণা করিয়াছে। স্বভাবতই দেশব্যাপী সমগ্র রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরমহলে সাজ সাজ রব শুরু হইয়া গিয়াছে। নির্বাচকমণ্ডলীও তাঁহাদের যাবতীয় চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করিতেছেন নির্দিষ্ট দিনটিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে। সমগ্র দেশেই একই চিত্র পরিলক্ষিত হইতেছে, পশ্চিমবঙ্গও ব্যতিক্রম নহে। নির্বাচনী ব্যস্ততা বঙ্গভূমিতেও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু একটি কারণে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী চিত্র অনেকাংশেই ভিন্নতর। যাহা ভূ-ভারতে ঘটে নাই, তাহাই ঘটিয়াছে বঙ্গভূমিতে। ষোড়শ সাধারণ নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তারকাখচিত নির্বাচনে পর্যবসিত হইয়াছে। সাধারণভাবে সমাজের যে কোনো ক্ষেত্রেই ‘তারকা’ বলিতে তাঁহাদেরই চিহ্নিত করা হয়, যাঁহারা নিজগুণে নিজক্ষেত্রে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত, সুপরিচিত। অর্থাৎ তারকা তাঁহারাই, যাঁহারা আপন-দক্ষতা ও যোগ্যতায় অপরাপর বহুজনের তুলনায় অগ্রবর্তী অবস্থানে বিরাজ করিতেছেন। এমত সংজ্ঞা অনুযায়ী ক্রীড়া জগৎ, সংস্কৃতি জগৎ বা সাহিত্য জগতের ন্যায় রাজনীতি জগতেও বহু তারকা অবস্থান করিতেছেন। মদীয় রাজ্যেও সন্ধান করিলে কতিপয় তারকার সন্ধান অবশ্যই মিলিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তারকা সম্পর্কিত উপরোক্ত সংজ্ঞাটি আদর্শ ব্যবস্থার মানদণ্ডে নির্ধারিত। কিন্তু নয়া উদারবাদের যুগে আদর্শের স্থলাভিষিক্ত হইতেছে ভোগ। রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে বাজার। স্বভাবতই ‘তারকা’-র চিরন্তন সংজ্ঞা অপসৃত না হইলেও, নূতন একটি সংজ্ঞাও যথেষ্ট সাড়া জাগাইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। তাহা হইল যেনতেনপ্রকারেণ সংবাদের শিরোনামে থাকিতে পারিলেই, তিনি তারকা। নীরবে নিভৃতে জনস্বার্থে নিরন্তর ভূমিকা পালন করিয়া মানুষের হৃদয়ে স্থান করিয়া লওয়া নয়, চমক সর্বস্ব বুলি আওড়াইয়া, মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ঝড় তুলিয়া, মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করিতে পারিলেই সংবাদ মাধ্যমে তিনি তারকা। এমত তারকা এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের আকাশে জাজ্বল্যমান। কিন্তু যেভাবেই তারকা হউন তিনি, তাঁহারা সকলেই রাজনৈতিক তারকা।

পশ্চিমবঙ্গে তারকাখচিত নির্বাচনের কথা বলিলে পাঠকবর্গের মনে হইতে পারে এমত তারকাখচিত নির্বাচনের কথাই সম্ভবত বলা হইতেছে। কিন্তু, না... আসন্ন নির্বাচনে যে সমস্ত তারকারা প্রার্থী হইবার জন্য মনোনয়ন পত্র পেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই রাজনৈতিক তারকা নহেন। রাজনীতির সাথে কস্মিনকালেও তাঁহাদের কোনো সম্পর্ক ছিল বলিয়া শুনা যায় নাই। অন্তত সাধারণ মনুষ্যকুলের সহিত যোগাযোগ রাখিবার অভ্যস্ততা আছে বলিয়াও শুনা যায় নাই। তাঁহারা তারকা— কেহ ক্রীড়াক্ষেত্রে, কেহ সংস্কৃতি জগতে। সম্পূর্ণ দূরলোকের বাসিন্দা। আবার সংস্কৃতি জগতের যাঁহারা অকস্মাৎ জনপ্রতিনিধি হইবার বাসনায় উদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহই গণসংস্কৃতির চর্চা করিতে করিতে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তেমনও নহে। নিতান্তই বিনোদনমূলক সংস্কৃতির তাঁহারা কুশীলব। তথাপি নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁহাদের যোগ্যতা লইয়া কোনো প্রশ্ন নাই। সঙ্গীত, অভিনয়, যাদুবিদ্যা, ফুটবল প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁহাদের মনোরঞ্জনকারী ভূমিকা অভিনন্দনযোগ্য হইতে পারে। হওয়া যুক্তি সঙ্গতও বটে।

কিন্তু প্রশ্ন হইল, তাঁহারা সংসদে হাজির হইয়া করিবেন কি? সংসদের কক্ষে ফুটবল খেলিবার মতো প্রশস্ত ক্ষেত্র নাই, ম্যাজিক দেখাইবার মঞ্চ নাই, ‘ঢিসুম ঢিসুম’ করিয়া একক কৃতিত্বে শতাধিক খলনায়ককে প্রহার করিবার সুযোগ নাই, বাঁক কাঁধে লইয়া শিবলিঙ্গে জল ঢালিবার ব্যবস্থাপনা নাই। বাদ্যযন্ত্র লইয়া সুর সৃষ্টির অনুমতি লোকসভার অধ্যক্ষ মহাশয় দিবেন বলিয়াও অনুমান হয় না। স্বভাবতই বিচিত্র গুণসমন্বিত তারকামণ্ডলী সংসদে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের মূল্যবান সময়ের অপচয় করিবেন না। ঐ সময়টুকু তাঁহারা ব্যয় করিবেন স্ব স্ব যশ ও খ্যাতি বৃদ্ধির প্রয়োজনে। ফলত, নির্বাচকমণ্ডলীর অভাব-অভিযোগ আইনসভায় পৌঁছাইবেই না—নির্বাচন কার্যত অর্থহীন হইয়া পড়িবে। বিগত নির্বাচনেও এমন কতিপয় তারকা প্রার্থীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। কিন্তু নির্বাচিত হইয়াও তাঁহারা পারতপক্ষে সংসদমুখী হন নাই এবং সামান্য যে কয়েকটি দিন উপস্থিত থাকিবার কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, মুখ খুলিয়া আইন সভার বিড়ম্বনা বৃদ্ধি করেন নাই—পেশাগত ব্যস্ততা হইতে নিষ্কৃতি লইয়া প্রয়োজনীয় বিশ্রামের জন্য আইনসভার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষটিকে ব্যবহার করিয়াছিলেন। এবংবিধ তারকাগণকে জন প্রতিনিধি করিবার অর্থই হইল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পরিহাস করা। তাঁহাদের নিজ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেওয়াই শ্রেয়। জনগণের মনোরঞ্জন হইবে, চক্ষুযুগলে ধূলিকণা নিক্ষিপ্ত হইবে না। □

১২ চৈত্র, ১৪২০

শোক সংবাদ

কমরেড স্বপন রায়

পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মচারী সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি কমরেড স্বপন রায় গত ৯ মার্চ, ২০১৪ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা বর্তমান।

কমরেড স্বপন রায়ের জন্ম কোচবিহার শহরে। পরবর্তীকালে পিতার কর্মসূত্রে বর্ধমান শহরে এসে সেখান থেকেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা পাশ করেও পরিবারের অভাবের তাড়নায় রাজ্য সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরে নিম্নবর্গীয় করণিক হিসাবে যোগদান করেন ও ২০১০ সালে পুনর্বাসন আধিকারিক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি তাঁর সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। অতঃপর আপন দক্ষতায় সমিতির বিভিন্ন পদ অলঙ্কৃত করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। দক্ষ সংগঠক, সদা হাস্যমুখ, পরোপকারী কমরেড রায় ছিলেন সমাজতন্ত্রের মতাদর্শে দীক্ষিত এক অবিচল সৈনিক। □

দাবি দিবস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

২৪ মার্চ এ নিয়ে যৌথভাবে প্রেস মিট করার কথাও বলেন। এরপর যুক্ত কমিটির পক্ষে তাপস ত্রিপাঠী ও জয়েন্ট কাউন্সিলের দেবমাল্য সোম কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করে ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদের অঙ্গীকার করেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সুকোমল সেন। তিনি বলেন, বর্তমানে কর্মচারী বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সম্ভাবনা বিপুল পরিমাণে দেখা দিয়েছে। পেনশন বেসরকারীকরণ, চুক্তিপ্রথায় নিয়োগ ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং শূন্যপদে নিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ ও সপ্তম বেতন কমিশনের দাবিতে এটি সর্বভারতীয় কর্মসূচী যা আজকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পালিত হচ্ছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভাঙার হুমকির প্রতিবাদে ত্রিপুরাসহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সভা ও মিছিল সংঘটিত হয়েছে। তিনি বলেন রাজ্যে দুর্বৃত্তরাজ চলছে। পুলিশ নির্বাক। উৎকোচ দিয়ে বুদ্ধিজীবী কেনা হচ্ছে যা ইতিহাসে হয়নি। সরকার অর্থের বিনিময়ে সব কাজ করছে। ন্যান্সী পাওয়েল রাজ্যে আসছেন অর্থ এবং কুবুদ্ধির মদত দিতে। নিশ্চিতভাবেই আমাদের আন্দোলন ওদের মনে ভয় সৃষ্টি করেছে তাই ওরা সহজে খোলা জায়গায় আমাদের কর্মসূচী করতে দেয় না। রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য কর্মচারীদের সামগ্রিক ঐক্য দরকার। এর জন্য আমাদের সাহসী হতে হবে, না হলে এগোতে পারব না। আসন্ন নির্বাচনে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে মাঠে ময়দানে প্রচারের জন্য পেনশনার্স সমিতির সদস্যদের আহ্বান করেন। তিনি আরও বলেন আমাদের দাবিগুলো সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের নির্বাচনী এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পাঠাতে হবে এবং সেই প্রচারপত্র বিলি করতে হবে। সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আন্দোলন কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর পর সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করে সভার কাজ শেষ হয়। সমগ্র কর্মসূচীটি পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র, যুক্ত কমিটির তাপসী ঘোষাল ও জয়েন্ট কাউন্সিলের কুন্তল কান্তি মণ্ডল। □ সুতপা হাজরা

দেশ বিক্রি রুখতে পারে কারা?

এনডিএ সরকারের সময়ে নির্বিচারে সরকারী সংস্থাগুলিকে বিক্রি করা শুরু হয়েছিল। এর জন্যে রীতিমত একটা আলাদা মন্ত্রকও খোলা হয়েছিল, সরকারের তরফে, যার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন অরুণ শৌরি। ঐ সময় থেকে শুরু করে একেবারে শেষদিন পর্যন্ত লাগাতার চালিয়ে যাওয়া হয়েছে দেশ বিক্রির কাজ। সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ শরিক হিসেবে তৃণমূল দল কার্যত সে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই সাহায্য করেছে। নীচের সারণী থেকে স্পষ্ট হবে সে কথা সে সময়ে—

সাল	কোম্পানী	বিলগ্নীর ধরন	ক্রেতা	পরিমাণ (%)	বাকি (%)	টাকার পরিমাণ (কোটি)	সরকার	মন্তব্য
১৯৯৯-০০	মডার্ণ ফুড	কৌশলগত	হিন্দুস্তান লিভার	৭৪	২৬	১০৫.৪৫	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	বালকো	ইক্যুইটি				২৭৫.৪২	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
২০০০-০১	বালকো	কৌশলগত	স্টারলাইট ইন্ডাঃ	৫১	৪৬	৫৫১.৫০	বিজেপি	—
	লাগান জুট	কৌশলগত	মুরলিধর রতনলাল	৭৪	২৬	২.৫৩	বিজেপি	—
২০০১-০২	এইচ টি এল	কৌশলগত	হিন্দুস্তান ফিউচারিস্টিক	৭৪	২৬	৫৫	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	সি এম সি	কৌশলগত	টাটা সন্স লিঃ	৫১	৩২.৩১	১৫২	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	হোটেল হাসান অশোক	কৌশলগত	মালনাদ হোটেলস	৮৯.৯৭		২.২৭	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	হোটেল বোধগয়া অশোক	কৌশলগত	লোটাস নিক্কো হোটেলস	৮৯.৯৭		১.৮১	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	হোটেল মাদুরাই অশোক	কৌশলগত	স্যাঙ্গু চক্র হোটেলস	৮৯.৯৭		৪.৯৮	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	টেম্পল বে অশোক	কৌশলগত	জি আর থাংগা মালিগাও	৮৯.৯৭		৬.১৩	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	হোটেল আগ্রা অশোক	কৌশলগত	মোহন সিং	৮৯.৯৭		৩.৬১	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	লক্ষ্মী বিলাস প্যালেস	কৌশলগত	ভারত হোটেলস	৮৯.৯৭		৬.৭৭	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	কুতব হোটেল	কৌশলগত	কনসর্টিয়াম অফ সুশীল গুপ্ত	৮৯.৯৭		৩৪.৪৫	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	লোদি হোটেল	কৌশলগত	সিলভার লিংক হোল্ডিংস	৮৯.৯৭		৭১.৯৩	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	আই বি পি লিঃ	কৌশলগত	ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোঃ	৩৩.৫৮	২৬	১১৫৩.৬৮	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	ভি এস এন এল	কৌশলগত	প্যানাটোন ফিনভেস্ট লিঃ	২৫	২৭.৯৭	১৪৩৯.২৫	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	ভি এস এন এল	ডিভিডেন্ড				২২৫০	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	ভি এস এন এল	কর্মচারী শেয়ার	কর্মচারী	১.৮৫	২৬.১২	২৫.১৯	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	পারাদ্বীপ ফসফেটস লিঃ	কৌশলগত	জুয়ারি মারক ফসফেটস	৭৪	২৬	১৫১.৭০	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	ইন্দো হক্কে হোটেলস লিঃ	কৌশলগত	ইনপ্যাক ট্রাভেলস	১০০		৬.৫১	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	মিনারেলস এন্ড মেটালস	স্পেঃ ডিভিঃ				৬০	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	স্টেট ট্রেডিং কর্পোঃ	স্পেঃ ডিভিঃ				৪০	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	সেন্টুর হোটেল, জুহু	তুলে দেওয়া	টিউলিপ হসপিটালিটি			১৫৩	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	আই টি ডি সি অশোক	৩০ বছর লিজ	ভারত হোটেলস			৩৯	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
২০০২-০৩	হিন্দুস্তান জিংক লিঃ	কৌশলগত	স্টারলাইট অপরিচুনিটিস	২৬	৪৯.৯২	৪৪৫	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	ইন্ডিয়ান পেট্রোকেমিক্যালস কর্পোঃ	কৌশলগত	রিলায়েন্স পেট্রো ইনভেস্টমেন্ট	২৬	৩৩.৯৫	১৪৯০.৮৪	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	হোটেল এয়ারপোর্ট অশোক	কৌশলগত	ব্রাইট এন্টারপ্রাইজ	৮৯.৯৭		১৯.৩৯	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	কোভালাম অশোক	কৌশলগত	এম ফার হোটেলস লিঃ	৮৯.৯৭		৪০.৩৮	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	ঔরঙ্গাবাদ অশোক	কৌশলগত	লোকসঙ্গম হোটেলস	৮৯.৯৭		১৬.৫০	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	মানালি অশোক	কৌশলগত	অটো ইম্পেক্স লিঃ	৮৯.৯৭		৩.৬৬	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	খাজুরাহো অশোক	কৌশলগত	ভারত হোটেলস	৮৯.৯৭		২.১৯	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	বারাণসী অশোক	কৌশলগত	কনসর্টিয়াম অফ রামনাথ	৮৯.৯৭		৮.৩৮	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	হোটেল রঞ্জিত	কৌশলগত	কনসর্টিয়াম অফ ইউনিয়ন হোটেলস	৮৯.৯৭		২৯.২৮	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	হোটেল ইন্দ্রপ্রস্থ	কৌশলগত	মরাল ট্রেডিং	৮৯.৯৭		৪৩.৩৮	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	চন্ডীগড় প্রজেক্ট	কৌশলগত	টি এ জি ভি কে	১০০		১৭.২৭	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	মডার্ণ ফুড	কৌশলগত	হিন্দুস্তান লিভার	২৫.৯৯৫		৪৪.০৭	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	সেন্টুর হোটেল, মুম্বাই	তুলে দেওয়া	বাটরা হসপিটালিটি			৮৩	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	হিন্দুস্তান জিংক লিঃ	কর্মচারী শেয়ার	কর্মচারী	১.৪৬	৪৮.৪৫	৬.১৯	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	সি এম সি	কর্মচারী শেয়ার	কর্মচারী	৬.০৬	২৬.২৫	৬.০৭	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	মারুতি উদ্যোগ লিঃ	শেয়ার বিক্রি	সুজুকি মোটরস		৪৫.৭৯	১০০০	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
২০০৩-০৪	হিন্দুস্তান জিংক লিঃ	আমন্ত্রণ মূলক	স্টারলাইট অপারচুনিটিস	১৮.৯২	২৯.৫৩	৩২৩.৮৮	বিজেপি	শরিক তৃণমূল
	জেসপ এন্ড কোং	কৌশলগত	ইন্দো ওয়াগন এঞ্জিঃ লিঃ	৭২	২৭	১৮.১৮	বিজেপি	শরিক তৃণমূল

সূত্র ঃ বিলগ্নীকরণ দপ্তর, ভারত সরকার

পরবর্তী অংশ অষ্টম পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে

ভারতীয় রেল ঃ বাগাড়ম্বর ও বাস্তবতা

ভারতবর্ষের সাধারণ বাজেট এবং রেল বাজেট দুটোই যেন দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের কাছে ফিকে করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সাধারণ মানুষ এটা বুঝতে অভ্যস্ত হয়েছে যে, বাজেট নিয়ে যতই নাচানাচি হোক, আখেরে জুটবে সেই মূল্য বৃদ্ধি আর অপ্রতুল পরিষেবা। সংস্কার মন্ত্রের ওপর আস্থা জ্ঞাপন করে যে বাজেট তৈরি হয়, তা যে বৃহত্তর অংশের মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না তা মানুষ বুঝে গিয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে রেলকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা যে নিকৃষ্ট পথ রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন দেখিয়েছিলেন, তা আজ এ রাজ্য তথা দেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার তথা কংগ্রেস দল রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার চক্রান্তকে ঘুরপথে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য তৎকালীন রেলমন্ত্রীকে রেল দপ্তরের তকমায় যথেচ্ছাচার করার সুযোগ করে দিয়েছে। তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ভূমিকাও আমরা লক্ষ্য করেছি। ২০১০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর জোকা-বিবাদি বাগ মেট্রোরেল প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয় তৎকালীন রেলমন্ত্রীর তৎপরতায়।এই শিলান্যাস হয়েছিল একটা বেসরকারী জমিতে, যা রেলের নয়। রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল, অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী এবং রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণগান্ধীর উপস্থিতিতে শিলান্যাস হল মহা ধুমধাম করে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ডাকা হল না। সেখানে যে গোড়ায় গলদ, তা কি কেউ দেখতে পেলেন না? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ব্রাত্য করে রাখা হল— এ কোন ভদ্রতার পরিচয়, সে প্রশ্ন কেউ করলেন না? রাতারাতি সেই শিলা রেলদপ্তর লুকিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে— এ কি রাষ্ট্রপতির অবমাননা নয়? সরকারের লাজলজ্জা বলে কি কিছু নেই?

একদিকে ভালই হয়েছে। শিলান্যাসগুলিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও তার দল ব্রাত্য ছিল রেল দপ্তরের কাছে। তা না হলে ৩৪ বছরে কিছুই হয়নির তালিকায় এই ফ্লপ শো গুলিকে হয়ত জুড়ে দিয়ে, ব্যর্থতাগুলিকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিত এই ভয়ঙ্কর সরকার।

দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের রেলমন্ত্রী হিসেবে মমতা ব্যানার্জী তিনটি রেল বাজেট পেশ করেছেন। এই রেল বাজেটগুলিতে তিনি ভুরি ভুরি প্রকল্পের ঘোষণার ফানুস উড়িয়েছেন, যার বেশীর ভাগটাই রাজ্যের জন্য। সময়ের সাথে সাথে তা অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। এই সকল প্রকল্পেরই কিছু তুলে ধরা হল যা আমাদের বিভ্রান্ত করেছে, আশাহত করেছে ও স্বপ্নভঙ্গ করেছে।

(১) বলা হয়েছিল হাওড়া, শিয়ালদহ, বোলপুর, মাঝেরহাট, খড়্গপুর, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনগুলিকে বিশ্বমানের স্টেশনে পরিণত করা হবে এবং সেই সঙ্গে গড়ে তোলা হবে মাল্টি ফাংশানিং কমপ্লেক্স। কাজের কাজ কিছুই হয়নি— খাওয়ার দু'একটা ঝাঁ চকচকে দোকান ছাড়া।

(২) ২০০৯-১০ সালের রেল বাজেটে এরাজ্যে চারটি মেডিক্যাল কলেজ পি পি পি মডেলে প্রস্তুত করার ঘোষণা ছিল। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করতে খড়্গপুর, বারাসাত, গার্ডেনরিচ এবং শিয়ালদহ বি আর সিং হাসপাতালে এই মেডিক্যাল কলেজগুলি তৈরী হবে। একটিও বাস্তবায়িত হয়নি।

(৩) পি পি পি মডেলে সাতটি নার্সিং কলেজ তৈরীর প্রতিশ্রুতি ছিল। ২০১০ সালে দুটির শিলান্যাসও হয়েছিল মহা ধুমধাম করে। এর সমাধি ঘটেছে সেখানেই। ২০১০-১১ সালের রেল বাজেটে বলা হয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় মানবোন্নয়ন দপ্তর, রেল দপ্তরের সাথে 'মৌ' চুক্তি করেছিল। বলা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে ১৩টি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করবে। দুর্ভাগ্য একটিও হয়নি।

(৪) ২০০৯ সালের ২৯ নভেম্বর শালিমারে অটোহাবের শিলান্যাস হয়েছিল। রেল দপ্তর বহু টাকা খরচ করে বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল এই অনুষ্ঠানের। পুরোটাই জলে গিয়েছে।

(৫) সিঙ্গুরে কিষাণ-ভিশন প্রকল্পে কোল্ড স্টোরেজ ও পেরিশেবল কার্গো সেন্টার গড়া হয়। কিন্তু তা মানুষের কাজে আসেনি। সবই তালা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।

(৬) ২০১০ সালের ৬ জানুয়ারি বরানগরের নোয়াপাড়ায় মেট্রোরেলের রেক মেরামতির কারখানার শিলান্যাস করে বলা হয়েছিল। পরবর্তীতে এটাই মেট্রোরেক প্রস্তুতের কারখানায় পরিণত করা হবে। হয়নি কিছুই। অথচ রাজ্যের বাইরে যেখানে রেক তৈরি হচ্ছে, সেখানে ট্রায়াল রান করার কোনো ব্যবস্থা নেই — ফলে কলকাতায় সেই কোচ অপারেশনের সময় প্রতিনিয়ত পরিষেবা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

(৭) কাঁচরাপাড়ায় রেলকোচ ফ্যাক্টরি ও তার সাথে অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল সায়েন্সের ধাঁচে একটি হাসপাতাল, একটি স্টেডিয়াম, একটি আন্ডারপাস তৈরি হবে বলে ঘোষণা করেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী। ২০১০ সালের ২১ মার্চ মহা ধুমধামে শিলান্যাস অনুষ্ঠান হয়। সে কাজ থমকে গেছে সেখানেই, হয়নি কিছুই।

(৮) ডানকুনি থেকে ফুরফুরা শরিফ পর্যন্ত রেলপথ, শিলান্যাস হয়েছিল দুবার— একবার রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ২০১০ সালের ১৩ মে এবং পরবর্তীতে দীনেশ ত্রিবেদী ২০১১ সালের ১২ নভেম্বর। কিন্তু কাজ এগোয়নি।

(৯) হলদিয়া ডি এম ইউ কোচ ফ্যাক্টরি এবং নন্দীগ্রামের কাছে জেলিংহ্যামে ওয়াগন তৈরীর কারখানার শিলান্যাস হয়েছিল ঢাক ঢোল পিটিয়ে কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

(১০) রেল দপ্তর ক্রীড়া অ্যাকাডেমি বানাবে বলে হাওড়া ও শিলিগুড়িতে দুটি শিলান্যাস করে— একটি তীরন্দাজী ও টেবিল টেনিস ও অপরটি শুধুই টেবিল টেনিস। কোনটাই বাস্তবায়িত হয়নি।

(১১) বেহালায় সত্যজিৎ রায় ইন্ডোর স্টেডিয়াম এবং বনগাঁয় গুরুচাঁদ স্টেডিয়াম— দুটোরই তিনি শিলান্যাস করেছেন— কিন্তু মানুষ ভাঁওতা ছাড়া কিছুই পায় নি।

(১২) ডানকুনির বিস্তীর্ণ জলাভূমি জোর করে বুজিয়ে দিয়ে তাতে ইলেকট্রিক্যাল লোকোমোটিভ ও ডিজেল লোকোমোটিভ ফ্যাক্টরির জন্য শিলান্যাস করা হয় এবং ফ্রেট করিডোর ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি শোনানো হয়। লক্ষ লোকের চাকরির প্রতিশ্রুতিও ছিল। সব কটি ঘোষণাই স্বপ্ন থেকে গেছে।

(১৩) ২০১০ সালের ৩১ অক্টোবর মমতা ব্যানার্জী পুরুলিয়ার গন্ধেশ্বরী নদীর পাশে ১৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিলান্যাস করেন — যা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। তখন বলা হয়েছিল এন টি পি সি -র সাথে এই প্রকল্পের চুক্তি হয়ে গেছে।

এই ভাঁওতার স্বর্গরাজ্য গড়ার আর কোন সুযোগ কি এদের দেওয়া উচিত? □ **সুগত দাস**

সাংগঠনিক কনভেনশন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিনিধি ও দর্শক প্রতিনিধি এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশন পরিচালনা করেন অশোক পাত্র, প্রদীপ গুপ্ত, চঞ্চল

শিবশঙ্কর রায়

ভট্টাচার্য, সীমা দত্ত এবং অঞ্জন ঘোষকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

শুরুতে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন অশোক পাত্র এবং নীরবতা পালিত হয়। সি আই টি ইউ এর সাধারণ সম্পাদক তপন সেন কনভেনশন উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন ৭০ দশকের জমি দখলের আন্দোলন থেকে শুরু করে, সেই সময়কার কর্মচারীদের আক্রান্ত অধিকার গুলি রক্ষা করার লড়াই এর শপথ নিয়ে যে আন্দোলনের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল তার মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল ১২ জুলাই কমিটি। আজ কর্পোরেট শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা। যেন ফ্যাসিবাদ, নাজিবাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমাদের রাজ্যে তথাকথিত পরিবর্তন যেন লুম্পেন রাজের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছে। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও মহিলাদের উপর নির্যাতন, ধর্ষণের ঘটনা ঘটেই চলেছে। প্রকাশ্যে বিরোধী দলের উপর সশস্ত্র আক্রমণ ও ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারগুলিকে দখল করে নেওয়া অব্যাহত আছে। দুনিয়া জুড়ে পুঁজিবাদের সঙ্কট আমাদের ভারতবর্ষেও সঙ্কট ডেকে এনেছে। ব্যাঙ্ক, বীমা, পেনশন ব্যবস্থাকে ফাটকা বাজারে ঠেলে দিতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার; এই কাজকে যেটুকু বিলম্বিত করা সম্ভব হয়েছে তা এই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফল। মনমোহন সিং বলেছেন পুরোপুরি বেসরকারীকরণ করতে না পারলে সঙ্কট মোকাবিলা করা যাবে না। কোন রাস্তায় এই সঙ্কট মোকাবিলা করা যায় তা বোঝার চেষ্টা না করে, মোদি বা রাহুলকে সামনে এনে বলা হচ্ছে বুড়ো মনমোহনের পরিবর্তে এরাই পারবে বর্তমান সঙ্কট থেকে দেশকে উদ্ধার করতে। কর্পোরেট মিডিয়া যে তর্জা চালাচ্ছে তাতে প্রকৃত অবস্থার উত্থাপন ঘটছে না।

নেতা পাইয়ে দেয় না— আমরা লড়াই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তা অর্জন করি। নেতা শুধু নেতৃত্ব দেয়, তাই কে আসবে ক্ষমতায় সেটা বড় কথা নয়। নীতি পরিবর্তনের লড়াইকে আরও শক্তিশালী করতে মানুষের ভিতরের ক্ষোভকে রাজনৈতিক আন্দোলনের মঞ্চে প্রতিফলিত করতে পারলেই সাফল্য আসবে। ব্লকস্তর পর্যন্ত সংগঠনের প্রতিটি স্তরের কর্মীদের উদ্যোগী হয়ে মানুষের কাছে বিকল্প কি তা তুলে ধরতে হবে। নিবিড় প্রচারের মধ্য দিয়ে সমাজের গভীরতম অংশে বিকল্পের স্রোত সৃষ্টি করতে হবে।

সুকোমল সেন তার বক্তব্যে বলেন কর্মচারী আন্দোলনের মঞ্চে আর্থিক দাবিদাওয়া থাকবে, এটা স্বাভাবিক, তবে এই মুহূর্তে সবথেকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামকে। এই সংগ্রামে যদি আমরা জয়যুক্ত হতে পারি তবে আমাদের আর্থিক দাবি-দাওয়াগুলির সমাধান করা সম্ভব হবে। তাই আর্থিক চাহিদাগুলিকে একটু পিছনে রেখে— কী কারণে ব্যাঙ্ক বীমা দুর্বল হচ্ছে, পুঁজিপতিরা কত পরিমাণ লোন গ্রহণ করে পরিশোধ করছে না, অর্থাৎ নন্-পারফরমিং অ্যাসেট হিসেবে সরকার তা দেখাতে চেষ্টা করছে—এই বিষয়গুলিকে বেশী বেশী করে তুলে ধরে প্রচার করতে হবে। এখন আমেরিকা কেন্দ্রে মনমোহনকে মদত না দিয়ে মোদিকে মদত দিচ্ছে। রাজ্যে বাম আন্দোলনের বিরোধিতা করতে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মদত দিচ্ছে। কিছু পচা গলা বুদ্ধিজীবী নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে যেখানে সেখানে চলে যাচ্ছেন। এর প্রতি তীব্র ঘৃণা ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের বীরের মত এগিয়ে চলতে হবে স্থির লক্ষ্যে।

ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংগঠনের নেতা রানা মিত্র, সর্বভারতীয় ডিফেন্স এ্যামপ্লয়িজ ফেডারেশন বেঙ্গল এরিয়ার নেতৃত্ব কাজল দে, ইর্স্টান রেল কর্মচারী ফেডারেশনের কানাই ব্যানার্জী, বি এসএন এল কর্মচারী সংগঠনের নেতৃত্ব শিশির রায়, প্রমুখ কনভেনশনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রতিবেদন পেশ করেন, শিবশঙ্কর রায় এবং আই সি ডি এস, রেগা নির্ভয়াকাণ্ড, শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট ছাঁটাই, জিডিপি-র নিরিখে সাধারণ মানুষের ক্যালরি গ্রহণের অনুপাত কম ইত্যাদি কতগুলি বিষয়কে আলোচনার জন্য উত্থাপন করেন। আয়-ব্যায়ের হিসাব পেশ করেন দিলীপ রায় এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে কেন্দ্র করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন সীমা দত্ত। এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন স্বাতী রায় বেরা। প্রতিবেদনের উপর দুদিন ব্যাপী আলোচনা হয়। এই আলোচনায় প্রতিটি জেলা ও অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলি থেকে মোট ৪১ জন অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ বলেন— কোন আন্দোলনকেই ছোটো করে দেখা ঠিক নয়। ৭০ দশকের অবস্থা আর আজকের দশক এক নয়। সামাজতান্ত্রিক শিবির ও তার মতাদর্শ এখন আক্রান্ত। পুঁজিবাদ পৃথিবীকে গ্রাস করতে চাইছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির

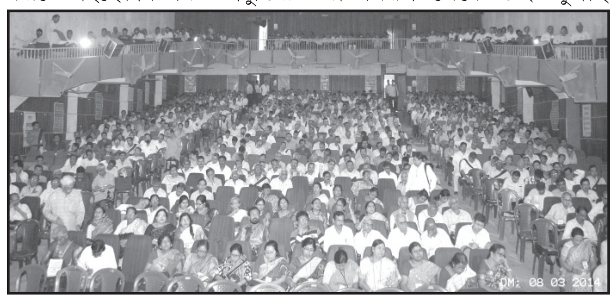

কনভেনশনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ।

অভূতপূর্ব উন্নতি পুঁজিবাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। ধনী দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান প্রকট। পৃথিবীটা একটা গ্লোবাল ভিলেজ-এ পরিণত হয়েছে। রাজ্যে নেমে এসেছে প্রশাসনিক সন্ত্রাস, ধর্মঘট করায় বেতন কাটা হয়েছে এবং চাকরি জীবন থেকে একটা দিন কেটে নেওয়া হয়েছে— যা বিগত ৩৪ বছরে হয় নি। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য কো-অর্ডির্নেশন কমিটিকে ভেঙে দিতে চাইছেন। চুক্তি, এজেন্সি, রি-এমপ্লয়মেন্ট ইত্যাদির দ্বারা নিয়োগ হচ্ছে। স্থায়ী প্রথায় নিয়োগ বন্ধ। যে টুকু নিয়োগ হচ্ছে, তা দলতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত হচ্ছে। একে প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধ যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন।

কনভেনশনে মোট ১৬টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১২ জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে শিবশঙ্কর রায় পিআরসি-র প্রভাত ঘোষের হাতে ১০ হাজার টাকার একটি চেক তুলে দেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় তার ভাষণে অতীত দিনের আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, যৌথ আন্দোলনের বাতাবরণ থেকে ১২ জুলাই কমিটির জন্ম হয়েছিল। যখন এই মঞ্চ গঠিত হয়েছিল তখন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন বা লগ্নি পুঁজির এই দৌরাত্ম্য ছিল না। বর্তমানে আমাদের এর বিরুদ্ধেই তীব্র লড়াই করতে হচ্ছে। এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নকে ভালো করে বুঝে নিয়ে, তার যে দর্শন রয়েছে তাকে প্রতিহত করার মতন শক্তি ও অনুপ্রেরণা নিয়ে এগোতে হবে। দাবির আন্দোলন করতে পারলেই যে পুঁজির মতাদর্শ পিছু হটবে তা নয়। আক্রমণ আগেও ছিল, এখনও আছে, তাই ১২ই জুলাই কমিটিকে আরও গভীরে ঢুকতে হবে। গোটা পশ্চিমবঙ্গ লুম্পেনাইজড হয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের সন্ত্রাস আগে দেখিনি। আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের বিপন্ন চরিত্রকে বিপদ মুক্ত করতে হলে বামপন্থী শক্তির পক্ষে জনমত গড়ে তুলে সংগঠনের প্রতিটি স্তরের কর্মী নেতৃত্বকে মানুষের খুব কাছে পৌঁছতে হবে। তবেই এই অষ্টম কনভেনশন মাইল স্টোন হয়ে থাকবে।

জবাবী ভাষণ দেন অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সমীর ভট্টাচার্য। দু-দিনের কনভেনশন থেকে ১২ই জুলাই কমিটির ৬২ জনের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। যুগ্ম আহ্বায়ক হন সমীর ভট্টাচার্য ও তপন দাশগুপ্ত। দপ্তর সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন প্রদীপ গুপ্ত। ১৩ জনের ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। ওয়ার্কিং কমিটিতে সমীর ভট্টাচার্য ছাড়াও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি থেকে প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন মনোজকান্তি গুহ এবং অমিত ভট্টাচার্য কনভেনশন থেকে বামপন্থী প্রার্থীদের আগামী লোকসভা নির্বাচনে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে, আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে কনভেনশনের সমাপ্তি হয়। □

সুগত দাস

রাজ্য কাউন্সিল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সম্মেলনের প্রাথমিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও জেলা/অঞ্চল/সমিতি ও সহযোগী সমিতি তাৎক্ষণিকভাবে পর্যালোচনা রিপোর্ট পাঠিয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাথমিক পর্যালোচনার সাথে সকলেই একমত হয়েছেন।

প্রচন্ড প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে অসীম সাহসিকতা ও প্রত্যয়ের সাথে এই রাজ্য সম্মেলনকে সফলতার শীর্ষে নিয়ে যাবার জন্য রাজ্য কাউন্সিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছে। সম্মেলনের প্রথম দিনের স্লোগান মুখরিত বর্ণাঢ্য মিছিল অশোকনগরবাসীদের উদ্বুদ্ধ করেছে। উদ্বোধক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সুবিমল সেনের বক্তব্য গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে সমস্ত সম্মেলনকে একটি ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। উদ্বোধনী অধিবেশনে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের অন্যতম সহ-সাধারণ সম্পাদক সুভাষ লাম্বার বক্তব্যও প্রতিনিধিদের উৎসাহিত করেছে। প্রয়াত জননেতা জ্যোতি বসুর জন্মশতবর্ষকে কেন্দ্র করে কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়-এর বক্তব্য প্রতিনিধি মনকে স্পর্শ করেছে। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সুকোমল সেন এবং ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক শিবশংকর রায়-এর বক্তব্য পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী হয়েছে। যুগ্ম-সম্পাদক মনোজকান্তি গুহর প্রতিবেদন উত্থাপন ছিল যথাযথ। প্রতিনিধিদের আলোচনা খুবই ভালো মানের হয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিকে ভেদ করে এগোবার প্রত্যয় প্রতিনিধিদের আলোচনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। অধিকাংশ আলোচকই নবীন প্রজন্মের প্রতিনিধি ছিলেন। আগামী কার্যক্রম সম্পর্কে নীতিসংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেছেন প্রবীণ নেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায়, যা সমগ্র সম্মেলনকে দিশা দেখাতে সমর্থ হয়েছে। সাধারণ সম্পাদকের জবাবী ভাষণ প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়েছে।

শেষ দিন সম্মেলন মঞ্চে এবং প্রকাশ্য সমাবেশের প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্মেলনের প্রধান অতিথি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মাণিক সরকার। কিন্তু প্রচণ্ড কুয়াশায় ৩০

রাজ্য কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ

ডিসেম্বর '১৩ কলকাতা-আগরতলা বিমান চলাচল বন্ধ থাকার কারণে তিনি আসতে পারেননি। প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রণব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য উপস্থিত প্রতিনিধি ও কর্মচারীবৃন্দ তথা সাধারণ মানুষকে উদ্বেলিত করেছে। সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রে প্রতিনিধিবৃন্দ ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকার বই ক্রয় করেছেন। সর্বোপরি পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাহীদা অনুযায়ী সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন বহিরঙ্গের বাহুল্য বর্জন করে অন্তর্বস্তুতে অত্যন্ত উন্নত মানের হয়েছে।

উপসমিতি গঠন ঃ সংগঠনের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও দৈনন্দিন কাজ সুচারুভাবে করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সমিতির অভিজ্ঞ ও নবীন প্রজন্মের নেতা-কর্মীদের যুক্ত করে ১৩ টি উপসমিতি গঠন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ঃ নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় সভা (প্রথম সভা সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে) ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ কর্মচারীভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় রাজ্য সম্মেলনের প্রাথমিক পর্যালোচনা সহ বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা ও আগামী কর্মসূচী সংক্রান্ত আলোচনা হয়।

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কর্মনির্বাহক কমিটির প্রতিনিধি ঃ সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করবেন মনোজ কান্তি গুহ ও অসিত কুমার ভট্টাচার্য । এছাড়াও কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির যুগ্ম-আহ্বায়িকা শিখা মুখার্জি ও সুতপা হাজরা পর্যায়ক্রমে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

বিগত কর্মসূচী পর্যালোচনা ঃ ২৯ জানুয়ারি ২০১৪ সংগঠনের উদ্যোগে আগামীদিনে সংগ্রামী হাতিয়ার সহ অন্যান্য সমিতির মুখপত্রগুলির প্রকাশনা কেন্দ্র করে (গাইড লাইন সংক্রান্ত বিষয়ে) সমিতিগুলির নেতৃবৃন্দ ও মুখপত্র সম্পাদকদের উপস্থিতিতে সভা হয়েছে।

৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত কর্মচারী স্বার্থবিরোধী কালা আদেশনামাগুলির বিরুদ্ধে সারা রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও কলকাতার ৭টি অঞ্চলের সমস্ত দপ্তরে টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ কর্মসূচী সফলভাবে পালিত হয়েছে।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের দুদিনের ধর্মঘটের প্রতি সংহতিমূলক কর্মসূচী হিসাবে ঐ দিন রাজ্যের প্রতিটি দপ্তরে টিফিন বিরতিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ২২ ফেব্রুয়ারি '১৪ নেতাজি ইন্ডোরে বিরোধী সংগঠনগুলিকে 'জোড়া লাগাবার জন্য' আয়োজিত সভায় মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভেঙে দেওয়ার হুমকির প্রতিবাদে ঐদিন রাজ্যের প্রতিটি সরকারী দপ্তরে টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভ সভাগুলিতে কর্মচারীদের স্বতস্ফুর্ত ও বিপুল উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ১২ ই জুলাই কমিটির আহ্বানে চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায্য আন্দোলনের উপর নির্মম পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙে দেওয়ার হুমকির প্রতিবাদে ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত বডি পোস্টারে সুসজ্জিত লাল পতাকাবাহী স্লোগান মুখরিত মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৬ মার্চ ২০১৪ বিগত ৩০, ৩১ জানুয়ারি ২০১৪ জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভা থেকে দেশের প্রতিটি রাজ্যে ৫ দফা দাবিতে ধরনা ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করার সিদ্ধান্ত হয় ৬ মার্চ ২০১৪। আমাদের রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার বিধিনিষেধ থাকার জন্য ঐ দিন কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে সভার মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচী সফলভাবে পালিত হয়েছে। প্রধান বক্তা ছিলেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সুকোমল সেন। জেলাগুলিতেও অনুরূপ কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

৮ মার্চ ২০১৪ আন্তর্জাতিক নারীদিবস উপলক্ষে সংগঠনের কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে। প্রধান বক্তা ছিলেন মহিলা আন্দোলনের নেত্রী কুমকুম চক্রবর্তী। সভায় মহিলা কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলাগুলিতেও ওই কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই কর্মসূচীগুলিতে নারীদের উপর বর্ধিত হিংসার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

৮-৯ মার্চ, ২০১৪ দুদিনব্যাপী ১২ই জুলাই কমিটির অষ্টম রাজ্য সাংগঠনিক কনভেনশন দক্ষিণ কলকাতার নিরঞ্জন সদনে সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। এর পূর্বে জেলাগুলিতে জেলা কনভেনশনগুলিও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। রাজ্য কনভেনশন থেকে সমীর ভট্টাচার্য এবং তপন দাশগুপ্ত যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি থেকে মনোজ কান্তি গুহ এবং অসিত কুমার ভট্টাচর্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছেন।

আগামী কর্মসূচী ঃ সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকারের ভয়াবহ প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ ও সামগ্রিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা সহ রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ রূপায়ণ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে আগামী কর্মসূচীর রূপরেখা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং নিম্নলিখিত কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

১) আন্তর্জাতিক নারীদিবসকে কেন্দ্র করে সর্বত্র কর্মসূচী প্রতিপালন করতে হবে।

২) ১ মে ১৪ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস সর্বত্র যথোপযুক্ত মর্যাদায় পালন করতে হবে।

৩) আগামী ২৪-২৬ মার্চ, ২০১৪ এবং ৩-৪ এপ্রিল, ২০১৪ দুটি পর্যায়ে সংগঠনগত ভাবে জেলা সফর এবং কলকাতার অঞ্চলগুলিতে ৭-৮ এপ্রিল, ২০১৪ কেন্দ্রীয় সফর প্রতিপালিত হবে।

৪) সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। যুক্ত কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি, জয়েন্ট কাউন্সিল, আশা এবং ও. বে. গভঃ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়) প্রভৃতি সংগঠনগুলিকে নিয়ে ২৭ মার্চ, ২০১৪ বিকেল ৫-৪৫মিনিটে মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। এর প্রাক্কালে ২৪ মার্চ, '১৪ কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে প্রেস কনফারেন্স। কনভেনশন থেকে আগামী কর্মসূচী নির্ধারিত হবে।

দাবি দাওয়া সংক্রান্ত ঃ সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমান রাজ্য সরকারের কর্মচারী স্বার্থবিরোধী আদেশনামার প্রতিবাদ করে মুখ্যসচিবের নিকট একাধিক চিঠি প্রদান করা হয়েছে। রাজ্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের জন্য ও বকেয়া ৪২% মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদানের জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

সাংগঠনিক করণীয় বিষয় ঃ

১) আগামী জুন, ২০১৪ মাসের মধ্যে সব সমিতির সদস্যপদ নবীকরণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে এবং সর্বশেষ সদস্য সংগ্রহ অভিযানের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাতে হবে।

২) সংগ্রামী হাতিয়ার ও এমপ্লয়িজ ফোরাম-এর গ্রাহকভুক্তি যথাক্রমে মার্চ ও মে '১৪-র মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং গ্রাহক সংখ্যা প্রেরণ করতে হবে।

৩) সংগঠন সম্মেলন তহবিল সংগ্রহ মার্চ '১৪-র মধ্যে শেষ করতে হবে এবং সমস্ত বকেয়া এপ্রিল ২০১৪-র মধ্যে কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা দিতে হবে।

সংগঠনের নিজস্ব ওয়েবসাইট ঃ সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করার কাজ চলছে। □

শুভেন্দু মাণিক্য সেনগুপ্ত, প্রিয়ব্রত ভৌমিক

ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের সর্বনাশ

কেন্দ্রীয় সরকারী হিসাব বলছে, খুচরো বাজার দরের সূচক সংখ্যায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য গত বেশ কয়েকদিন ধরে ১০ শতাংশের উপরে রয়েছে। বিগত ২০০৪ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ১৫৭ শতাংশ। চাল ও গমের মূল্যবৃদ্ধি যথাক্রমে ১৩৭ শতাংশ ও ১১৭ শতাংশ। ডাল, আলুর ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ১২৩ শতাংশ ও ১৮৫ শতাংশ এবং সবজি ও পেঁয়াজের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩৫০ শতাংশ ও ৫২১ শতাংশ।

গত এক বছরে তরিতরকারির দাম কত শতাংশ বেড়েছে, তার একটা হিসাব প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায়। এতে দেখা যাচ্ছে গত ২০১২-র অক্টোবরের তুলনায় ২০১৩-র অক্টোবরে টন প্রতি বিভিন্ন তরিতরকারির দাম বেড়েছে ৫০ থেকে ৩৫২ শতাংশ পর্যন্ত। সমস্ত ধরনের তরিতরকারির দাম আকাশ ছোঁয়া হয়েছে—কিন্তু পরিবর্তনের সরকারের তাতে কোনো হেলদোল লক্ষ্য করা যায়নি। শীতের সময় শীতের ফসল বাজারে আসলে সবজির দাম কমার কথা, কিন্তু তা ঘটেনি, বাজার আগুন হয়েই রয়েছে। নয়া উদারনীতিগুলিকে অনুসরণ করার ফলশ্রুতিতে ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে চরম সঙ্কট নেমে এসেছে। ১৯৯১ সাল থেকে কৃষিক্ষেত্রে সরকার তার ভূমিকা হ্রাস করতে শুরু করে। তার ফলশ্রুতিতে কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ক্রমশ নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও সরকার কৃষি পণ্যের ব্যবসাকে উদারীকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যথেচ্ছ কৃষি পণ্যের আমদানির অনুমতি দিয়ে চলেছে এবং তার জন্য শুল্ক হ্রাসও করছে।

এই অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধি দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে খেটে খাওয়া গরীব মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে। এর জন্য দায়ী আর কেউ নয়, কংগ্রেস ও বিজেপি'র অত্যন্ত প্রিয় নয়া উদার আর্থিক নীতি, যে নীতি সমস্ত ধরনের সামাজিক পরিষেবা থেকে সরকারকে হাত তুলে দিতে বলে, যে নীতি যে কোনো ধরনের সরকারী ভরতুকীর বিরোধী। এই নীতির জন্যই আজ সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা আক্রান্ত। এমনকি এই নীতিকে এফ সি আইয়ের গুদামে পচে নষ্ট হলেও তা গরীব অভুক্ত দেশবাসীকে বিতরণ করা যাবে না। গত ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখের তথ্য বলছে যে এফ সি আইয়ের গুদামে ২৪ মিলিয়ন টন (২.৪ কোটি টন) গম মজুত থাকলেও তা রেশনের মাধ্যমে গরীব মানুষকে বিতরণ করার কোনো কর্মসূচী নেওয়া হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে। এমনকি মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট যখন এফসিআই-এর গুদামে মজুত খাদ্যশস্য সাধারণের মধ্যে বিতরণ করার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় সরকারকে, তখন সেই সরকারের কৃষিমন্ত্রী হঠাৎ অতি সংবিধানপ্রেমী হয়ে গিয়ে বললেন, যে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী এরকমভাবে বিতরণ করার কোনো পদ্ধতি নেই। এই নীতির বেড়াজালে আটকেই ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে যখন কর্পোরেট মহলকে কর ছাড় দেবার পরিমাণ ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার কোটি টাকা, তখন সকলের জন্য গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবার পিছু ২ টাকা কেজি দরে মাসে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য দেবার টাকা নেই।

এই ভয়ানক অর্থনীতি, যা চালু হয়েছিল ১৯৯১ সালে নরসীমা রাওয়ের আমলে, তা পরবর্তীকালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জমানায় আরও শক্তি বর্ধন করেছে এবং বর্তমান ইউপিএ-২ সরকার বেপরোয়াভাবে এই নীতি কার্যকর করে চলেছে। এই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এনডিএ সরকারের শরিক থাকা অবস্থায়, বর্তমান কেন্দ্রের ইউপিএ-২ সরকারের যতদিন শরিক ছিলেন সেই সময়কালে এবং এই রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ৩৩ মাসের শাসনকালে সবসময় নয়া উদার অর্থনীতিকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন শিথিল, পেট্রোলের দাম সম্পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ, পি এফ আর ডি এ বিল ইত্যাদির ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল জনস্বার্থবিরোধী। বর্তমানে ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ নয়া উদার আর্থিক নীতিরও সমর্থক এই রাজনৈতিক দলটি। সেই প্রেক্ষিতেই মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি দেখতে হবে। নয়া উদার আর্থিক নীতির কুপ্রভাবেই সারা বছর জুড়ে দেশব্যাপী মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে।

মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী নয়া উদার অর্থনীতি। এই নীতির ফলে যা ঘটছে তা নিম্নরূপ—

(ক) খাদ্যশস্যের আগাম বাণিজ্য বৃদ্ধি ঃ এগ্রিকালচারাল প্রোডিউস মার্কেট কমিটি অ্যাক্ট সম্পূর্ণভাবেই পাইকারী ও মজুতদারদের পক্ষে কাজ করছে, যারা কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য ঠিক করে এবং বাজারকে নিজেদের সুবিধামতো নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলস্বরূপ দেখা যায় গমের জন্য যখন সরকার সহায়ক মূল্য ১৪০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল ধার্য করে, তখন বাজারে তার দাম ১৮০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। এর ফলে কৃষক বাধ্য হয় খোলা বাজারে এসে মজুতদারদের উপর তাদের ভবিষ্যৎ সঁপে দিতে। উৎসাহিত হয় ফাটকা কারবারিরা, বৃদ্ধি পায় আগাম বাণিজ্য।

ফরওয়ার্ড মার্কেটস কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১ এপ্রিল ২০১১ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত সময়ে আগাম বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১০৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৬০ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০১০ সালে ঐ সময়কালে আগাম বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬১ লক্ষ ৫১ হাজার ৬৫৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ৭২.৬৩ শতাংশ।

ঐ সময়কালে কৃষিপণ্যে সম্মিলিত বাণিজ্যের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৬ হাজার ২১৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১০ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ৫৩.৪২ শতাংশ।

রাষ্ট্রসংঘের সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে আগাম বাণিজ্যের ফলে সারা বিশ্বের সাথে ভারতেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে।

সঙ্গত কারণেই বামপন্থীদের দাবি খাদ্যশস্যের আগাম বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন বাতিল করা ঃ ১৯৫৫ সাল থেকে দেশে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন চালু ছিল। এর মধ্য দিয়ে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর দামের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল। একে আরও শক্তিশালী করা হয় ১৯৮১ সালে। বর্তমানে এই আইন লঘু হয়ে গেছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী হিসাবে ১৯৮৯ সালে মোট ৭০টি সামগ্রীর নাম নির্দিষ্ট ছিল। এনডিএ সেটা ২৫টিতে নামিয়ে আনে। ২০০২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী আদেশ (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২) কার্যকর করে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনে লাইসেন্সিং, বিশেষ খাদ্য সামগ্রীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও মজুতসীমা ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেয় কোনো লাইসেন্স পারমিট ছাড়াই। এর দ্বারা ডিলাররা গম, খাদ্যশস্য, চিনি, ভোজ্য তৈলবীজ এবং ভোজ্য তেল অবাধে কিনতে পারে। মকুব করতে পারে, বিক্রি করতে পারে ও বণ্টন করতে পারে। ডাল, গুড়, ময়দা, আটা ও বনস্পতির মতো খাদ্য সামগ্রীর উপরে এ ধরনের নিয়ন্ত্রণবিধি ২০০৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার তুলে দেয়। ১৯৮০ সালে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর কালোবাজারী রোধ ও সরবরাহ রক্ষার আইনে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা ছিল। ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে এনডিএ সরকার এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারী করে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ছাড়াও সব পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায় ফাটকাবাজদের অনুমতি দেয়। এটা হল ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে আগাম চুক্তি। ১৯৫২ সালের আইনে এই ধরনের চুক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা ছিল।

কৃষিতে সরকারি ভর্তুকি হ্রাস ঃ সমস্ত দেশে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শ্লথতা ও অনিশ্চয়তা সমগ্র দেশে কৃষিজমির মধ্যে বিশেষত খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে সেচ জমির অনুপাত ৪৫ শতাংশ এখনও অতিক্রম করেনি। উদারনীতির ফলেই কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সার কারখানাগুলিতেও কেন্দ্রীয় বিনিয়োগকে পরিকল্পিত ভাবে অবহেলা করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে অবহেলার শিকার হলদিয়া ও দুর্গাপুরের কেন্দ্রীয় সার তৈরির কারখানা।

নয়া উদারনীতির পথ ধরে কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ ক্রমহ্রাসমান। ফলে সেচের জল, বিদ্যুৎ, সার প্রভৃতির মূল্য বেড়েই চলেছে। এর দ্বারা বৃদ্ধি পাচ্ছে কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে ২০১২-১৩ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে সারের উপর ভর্তুকি পূর্বের বছরের তুলনায় প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা কমানো হয়েছিল। বর্তমানে ইউরিয়া ছাড়া অন্য সারের দাম দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কারণ পটাশিয়াম নাইট্রেট জাতীয় সারের বিনিয়ন্ত্রণ ঘটিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর দ্বারা মজুতদার, কালোবাজারীদের উপকার হয়েছে। আর কৃষকের সর্বনাশ হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ডিজেল ও অন্যান্য পেট্রোপণ্যের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি এবং রেলের পণ্যমাশুল বৃদ্ধি। এই সবকিছুর জন্য বৃদ্ধি পেয়েছে পরিবহন ব্যয়। কৃষি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের এই ক্ষেত্রটিও আক্রান্ত হয়েছে।

বামপন্থীরা কৃষিতে সরকারী ভর্তুকি বৃদ্ধি এবং পেট্রোপণ্যের মূল্যের উপর অবিলম্বে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ চালু করার দাবি করেছে।

গণবন্টন ব্যবস্থাকে দুর্বল করা ঃ মূল্যবৃদ্ধির কোপ থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে কার্যকর পদক্ষেপ হল সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপকভাবে কার্যকর করা। বেসরকারী মজুতদারদের বাড়বাড়ন্ত এর মধ্য দিয়ে কমানো যাবে। সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা প্রয়োজন দেশের মানুষের অপুষ্টির হার রোধ করার জন্য। একটি সমীক্ষা বলছে দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষই প্রয়োজনীয় দৈনিক ২২০০ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। বর্তমানে এপিএল, বিপিএল দুই ভাগে গণবন্টন ব্যবস্থা চালু রাখার মধ্য দিয়ে কার্যত এই ব্যবস্থা অকার্যকর করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২ টাকা কেজি দরে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য কেন্দ্রের প্রয়োজন ৯ কোটি টন খাদ্যশস্য (ভারতে ২২ কোটি পরিবার ধরে)। ২০১১-১২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকের কাছ থেকে টন প্রতি ১১২০ টাকা দামে গম এবং ১৬২০ টাকা দামে চাল ক্রয় করে। এর সাথে সংরক্ষণ ও পরিবহন ব্যয় ধরলে প্রতি কেজি চাল ও গমের আর্থিক মূল্য (ইকনমিক কস্ট) পড়ে যথাক্রমে ২০ টাকা ও ১৫ টাকা। (সূত্র অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১-১২,পৃষ্ঠা ১৯৮)। গড়ে ১৭ টাকা। অর্থাৎ প্রতি কেজি খাদ্যশস্যে ভর্তুকির পরিমাণ হয় ১৫ টাকা। ৯ কোটি টন খাদ্যশস্যের জন্য ভর্তুকির প্রয়োজন ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা। ২০১২-১৩ সালের বাজেটে খাদ্যে ভর্তুকির জন্য ধরা হয়েছিল ৭৫ হাজার কোটি টাকা। যা জি ডি পি-র মাত্র ০.৬ শতাংশ। অথচ এই সামান্য টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকিতে ব্যয় করতে রাজি নয়। অন্যদিকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা কর্পোরেটদের কর ছাড় দিয়ে যাচ্ছে এই সরকার।

তাই বামপন্থীদের সঙ্গত দাবি এপিএল, বিপিএল নির্বিশেষে সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং ১৪টি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য রেশনের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নগদ মূল্যে ভর্তুকি হস্তান্তরের প্রকল্প বাতিল করে যথাযথ খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প চালু করতে হবে।

খুচরো বাণিজ্যে বিদেশি বিনিয়োগ ঃ বিগত পাঁচ বছর ধরে এই নীতির ফলে প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হয়েছে সাধারণ মানুষ। খাদ্যদ্রব্য সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির এটিও অন্যতম কারণ। আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির স্বার্থে ভারত সরকার প্রথমে এক ব্যান্ডের পণ্যের উপর প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ চালু করে। অনেক চেষ্টা করেও ইউপিএ-১ সরকার বামপন্থীদের প্রবল বাধায় বহু ব্র্যান্ডের পণ্যের উপর এফ ডি আই চালু করতে পারেনি। কিন্তু অর্থনীতির প্রশ্নে একই পথের শরিক তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে ইউপিএ-২ সরকার বহু ব্র্যান্ডের খুচরো বাণিজ্যেও এফডিআই চালু করে দিয়েছে। এর পরিণতিতে শুধু মূল্য বৃদ্ধি নয়, কর্মসংস্থান প্রসঙ্গটিও গভীরভাবে আক্রান্ত হবে।

খুচরো ব্যবসায় বিদেশি কোম্পানিগুলি যেখানে যেমন অর্থাৎ কোথাও ভারতীয় কোম্পানির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে—আবার কোথাও সোজাসুজি এসে পড়ছে। তারা শুধু ব্যবসা নিয়েই থাকছে তা নয়—তারা চালু করেছে তাদের নিজস্ব সরবরাহ, উৎপাদন, গুদামজাত ও সংগ্রহ ব্যবস্থা। ফলে এ দেশের এবং এ রাজ্যের এই সংক্রান্ত যে ব্যবস্থাগুলি ছিল তাও একে একে ভেঙে পড়ছে। কৃষক কোন জমিতে কোন ফসল করবে, কোথা থেকে ঋণ নেবে, কোথায় বিক্রি করবে—সবই আজ স্থিরীকৃত হচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির ব্যবস্থাপনায়। বাজারে জিনিসের দাম প্রথমে কম থাকলেও তা প্রতিযোগিতায় আধিপত্য পাওয়ার সাথে সাথেই বেড়ে যাচ্ছে। ওয়ালমার্ট, ক্যারিফোর, টেসকো, পেপসিকো, আইকিয়া ইত্যাদিকে ঠেকাতে না পারলে বাড়বে জিনিসের দাম এবং বেকারী। এ এক নতুন দাসত্বের বন্ধন—স্বাধীনতা থাকলেও তার স্বাদ থাকবে না।

তাই সঙ্গতকারণেই বামপন্থীরা সব ধরনের খুচরো বাণিজ্যে বিদেশি বিনিয়োগের নীতি বাতিল করার দাবি করেছে।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঃ এনডিএ সরকারের আমলে পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রশাসনিক দাম বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এবং ৬ বছরে ৩৩ বার পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ানো হয়েছিল। এই সময়ে কেন্দ্রের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন মমতা ব্যানার্জী। ইউপিএ-১ সরকার বেশিরভাগ সময় বামপন্থীদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল বলে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির উপর অনেকটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে এই বাধ্যবাধকতা না থাকায় মানুষের উপর বোঝা চাপছে। এমনকি ২০১১ সালে ক্যাবিনেটের (যে ক্যাবিনেটে মমতা ব্যানার্জী একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা ছিলেন) সিদ্ধান্তক্রমে পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি খোলা বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধিকে যুক্তিপূর্ণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বামপন্থীরা ইউপিএ-১ আমল থেকে বারংবার পেট্রোপণ্যের শুল্ক কাঠামোর পর্যালোচনা করার দাবি জানানো সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার তা মানতে রাজী নয়। শুল্ক কাঠামোর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এড়ানো সম্ভব। অবশ্য বামপন্থী দলগুলির চাপে প্রথম ইউপিএ সরকার পেট্রোপণ্যের উপর শুল্ক কাঠামো কিছুটা পুনর্বিন্যাস করেছিল। তা সত্ত্বেও এখনও পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সরকারের আয় বৃদ্ধি ঘটিয়ে যাচ্ছে। ফলে পেট্রোপণ্যের দরদাম আর বৃদ্ধি না করে প্রয়োজনে শুল্ক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা। এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে কিছুটা রেহাই দেওয়া যায়। বামপন্থীরা এই দাবিই করে আসছে।

এছাড়াও দেশের দুটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও এন জি সি এবং অয়েল ইন্ডিয়া। যারা দেশের মোট চাহিদার ২৫ শতাংশ মেটায়, তাদের উত্তোলিত তেলের উপর কেন্দ্রীয় সরকার 'সেস' আরোপ করে। এই বোঝাটাও সাধারণ মানুষকে বহন করতে হয়। এই সেস আদায়ের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৪ সালের আইন অনুযায়ী এই সেসের টাকা থেকে প্রতি বছর ৭৫০০ কোটি টাকা তেল শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করার কথা, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তার খুব সামান্যই উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে দিয়েছে। বাকিটা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তার বাজেটের খরচ মেটাচ্ছে।

রাজ্য সরকারের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠার পর বহু কৃষক আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। এদের বেশিরভাগটাই ধান, পাট ও আলু চাষের সাথে যুক্ত। এরা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে ঋণ গ্রহণ করে চাষের কাজে লাগায়, কিন্তু ফসলের লাভজনক মূল্য না পেয়ে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। ঋণ শোধ করার কোনও উপায় করতে না পেরে হতাশা ও সামাজিক লাঞ্ছনার শিকার হয়ে তাঁরা আত্মহননের পথ বেছে নেন। সরকার ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করলেও তা এই কয় বছরে পূরণ করা হচ্ছে না বা সংগ্রাহক মূল্যের উপর বোনাস ঘোষণাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চালকল মালিকদের ধান সংগ্রহের কাজে লাগানো হচ্ছে—কোথাও কোথাও যে সমস্ত চেক চাষিদের হাতে দেওয়া হয়েছে চালকলের তরফ থেকে তা ব্যাঙ্কে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় বাতিলও হয়েছে। প্রতি নিয়ত চাষিরা বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে ধান, পাট, আলু প্রভৃতি উৎপাদন করে এই রাজ্যের কৃষক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বারে বারে। ফলে উৎপাদন বন্ধ রাখছে। বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি ঘটছে ও এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীগণ তার মুনাফা অর্জন করছে, আর আমাদের সরকার চোখ বুজে থাকছে।

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল নেত্রী ক্ষমতায়

(একাদশ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

বহু বিজ্ঞাপিত গুজরাট মডেলের প্রকৃত চিত্র

বেঁচে থাকার মরিয়া প্রচেষ্টা।

সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতির প্রতিবাদে গান্ধীনগরে মানুষের মিছিল

পশ্চিমবঙ্গে এসে তিনটি লাড্ডু খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য এক 'দৌড়বীর' নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। তিনটি লাড্ডুর মধ্যে রাজ্যের লাড্ডুর স্বাদ পশ্চিমবঙ্গবাসী ভালই বুঝছেন। দিল্লিতে বর্তমান রাষ্ট্রপতির পশ্চিবঙ্গের প্রতি অতীত অবদানের জন্য ঐ লাড্ডুর স্বাদ আমাদের জানা। এখন গুজরাটের লাড্ডুটি কেমন— কি তার ইতিহাস, একটু দেখা প্রয়োজন। 'গুজরাট কিলিং'এর নায়ক নরেন্দ্র মোদীর কথা আমাদের জানা। সমস্ত ধামাচাপা দিয়ে দেশী-বিদেশী কর্পোরেট সংস্থা আজ চাইছে দুর্নীতিতে বিপর্যস্ত কংগ্রেসের পরিবর্তে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে, আর তার সারথি হবেন মোদী। তাঁর ভাবমূর্তি নির্মাণে ১১০০টি জায়গায় ২ কিমি ব্যাপী কর্পোরেট পুষ্ট 'রান ফর ইউনিটি' দৌড়ের আয়োজন হয়েছে ১৫ ডিসেম্বর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ৬৬তম মৃত্যুবার্ষিকীতে। দেশের প্রতিটি গ্রাম থেকে মাটি ও লোহার টুকরো এনে ৬০ ফুট উঁচু মূর্তি গড়া হবে গুজরাটে। যাতে সমস্ত গ্রামে ঢোকা যায় তাই গ্রাম প্রধানদের ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে। তা লাগানো হবে ঐ মূর্তির নীচে। আত্মপ্রচারের টোপ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রচার হচ্ছে 'ঐক্য'-এর জন্য এই দৌড়। আসলে দৌড় লোকসভা নির্বাচনের জন্য, লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি।

তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেখানো হচ্ছে গোটা দেশে এই মুহূর্তে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নরেন্দ্র মোদী। আসল রহস্য ফাঁস করেছে এক অনুসন্ধানী ওয়েবসাইট। 'অপারেশন ব্লু ভাইরাস' নামে স্টিং অপারেশন কোবরা পোস্ট দেখিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অন্তত ২৫টি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার ব্যবস্থাপনায় কিছু কর্মীর ভুয়ো একাউন্ট তৈরী করে মোদীর ফলোয়ারের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে, কিছু কর্মী বিরোধীদের কুৎসা করছেন। আর কিছু জন মোদীর বিরুদ্ধে কিছু লিখতে দেখলে তা দ্রুত মুছে দিচ্ছেন। নিখুঁত টীম ওয়ার্ক। যাতে ধরা না পড়তে হয় তাই অ্যাসেম্বলড কম্পিউটার ব্যবহৃত করে কোরিয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশের বিদেশী আই সি অ্যাড্রেস ব্যবহৃত হচ্ছে। তারপর বিপক্ষকে কুৎসা করে কম্পিউটার নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। তার বিনিময়ে লেনদেন হচ্ছে নগদে। দেখা যাচ্ছে মোদীর টুইটার প্রোফাইলের ৭৩% ফলোয়ারই ভুয়ো!

লৌহমানব মোদী গুজরাট কেমন চালিয়েছেন? কোন সাফল্যের শীর্ষ থেকে দেশের মসনদে আসতে চাইছে বিজেপি নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর হাত ধরে?

বৃদ্ধির হারে শীর্ষচ্যুত : অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধির হারে গুজরাট ঐতিহাসিকভাবেই এগিয়ে। কিন্তু মোদীর সময়ে কী অবস্থা? মোদী ক্ষমতায় আসার আগে ১৯৯৫ থেকে ২০০০ গুজরাটে বার্ষিক বিকাশের হার ৮.০১ শতাংশ। রাজস্থানের (৮.৩৪ শতাংশ) ঠিক পরে। গুজরাট ছিল দু'নম্বরে। তখন বিহারে ছিল ৪.৭০ শতাংশ।

এখন ২০০৪-২০১২ সালে গুজরাটে জিডিপির হার ১০.১ শতাংশ জাতীয় গড় ৮.৩ শতাংশ। আর মহারাষ্ট্র ১০.৮ শতাংশ, তামিলনাড়ু ১০.৩ শতাংশ এমনকি বিহার ১১.৪ শতাংশ নিয়ে গুজরাটের থেকে উপরে। এমনকি সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশও গুজরাটকে ছাপিয়ে উঠে গেছে।

ঋণ : নরেন্দ্র মোদীর মুখ্যমন্ত্রিত্বে ঋণ বেড়েছে ৪ গুণ। ২০০১-২০১৩র মধ্যে তুলনায় ২০০১এ ঋণ ছিল ৪২৭৮০ কোটি টাকা, আর ২০১৩ তে এসে তা দাঁড়িয়েছে ১,৭৬,৪৯০ কোটি টাকা। মাথাপিছু ঋণে গুজরাট শীর্ষস্থান দখল করে আছে। মাথাপিছু ২৯,২২০ টাকা। প্রসঙ্গত বাম সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু ঋণ ছিল ২০,৪৭১ টাকা আর এখন তৃণমূল সরকারের আমলে তা বেড়ে হয়েছে ২৫,২৩৮ টাকা।

বিদেশী বিনিয়োগে পিছিয়ে : ২০০০ থেকে ২০১১ অবধি গুজরাটে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ ৭.২ বিলিয়ন ডলার। যেখানে মহারাষ্ট্রে হয়েছে ৪০ বিলিয়ন ডলার। দিল্লিতে ২৬ বিলিয়ন ডলার।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি শূন্য : জাতীয় নংমুনা সমীক্ষার হিসাব অনুযায়ী গত ১২ বছরে গুজরাটে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার শূন্য। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ গুজরাট। স্থায়ী কর্মসংস্থান কম। অস্থায়ী ও ঠিকার রমরমা। মজুরির হার কম। এন এস এস ও(NSSO)-র হিসাব অনুযায়ী গুজরাটে অসংগঠিত ক্ষেত্রে দৈনিক মজুরি ১০৬ টাকা, যেখানে কেরলে ২১৮ টাকা। গ্রামীণ ক্ষেত্রে মজুরি পাঞ্জাবে ১৫২ টাকা, সেখানে গুজরাটে ৮৩ টাকা। দেশের মধ্যে ১২তম রাজ্য।

গ্রামীণ পরিকাঠামোয় ১৪ নম্বর : ইন্ডিয়া রুরাল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০১২-১৩ অনুযায়ী পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও নিকাশী ব্যবস্থা থাকা পরিবার সারা ভারতে আছে ১৮ শতাংশ। গুজরাটে আছে ২৫ শতাংশ। কিন্তু কেরালায় আছে ৭১ শতাংশ পরিবারের। গুজরাট থেকে এগিয়ে আছে ১৩টি রাজ্য।

দারিদ্র্য চারিদিকে : যোজনা কমিশনের ২০১২-১৩ রিপোর্ট থেকে প্রকাশ গুজরাটে ৬ কোটি ৩ লক্ষ জনসংখ্যার ১ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষ (২৩ শতাংশ) দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন। যেখানে কেরালা (১২%), ত্রিপুরা (১৭.৪%), হিমাচল (৯.৫%) সহ অনেক রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষ অনেক কম।

শিক্ষায় পশ্চাতে : সাক্ষরতায় সারা দেশের মধ্যে গুজরাট ১৩ নম্বরে। ২০১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী কেরালার সাক্ষরতার হার ৯৩ শতাংশ, ত্রিপুরায় ৮৭ শতাংশ কিন্তু গুজরাটে ৭৯ শতাংশ। স্কুলছুটের হার গুজরাটে ৫৭.৯ শতাংশ যা জাতীয় গড় ৪৯.৩ শতাংশ থেকে অনেক বেশী। গুজরাটে স্কুলছুটদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ দলিত ও ৭৮ শতাংশ উপজাতি স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারে না। শিক্ষক ও ছাত্রে হার ইন্টারমিডিয়েট স্তরে ৫২ জন প্রতি শিক্ষক যেখানে জাতীয় গড় ৩৪ জন। উচ্চ বিদ্যালয় স্তরে ৩৩ জন প্রতি শিক্ষক যেখানে ১৮-২৩ বছরের মধ্যে ৩০ জন। উচ্চ শিক্ষায় যোগদানের হার মাত্র ১৭.৬ শতাংশ যা জাতীয় গড় ২০.৪ শতাংশের থেকে কম। যেখানে তামিলনাড়ুতে ৩৮.২ শতাংশ এবং মহারাষ্ট্রে ২৭.৪ শতাংশ।

(সূত্র : SHES 2011-1212, MHRD, SES 2010-11 MHRD)

স্বাস্থ্যে লবডঙ্কা : গুজরাটে শিশু মৃত্যুর হার এক বছরের মধ্যে (প্রতি হাজারে) ৩৮ জন, গ্রামীণ ক্ষেত্রে যা ৪৫ জন। (কোন কোন জেলায় ৫৫ জন) যা উন্নত রাজ্যগুলি থেকে অনেক বেশী (কেরল ১২ জন, তামিলনাড়ু ২১ জন, মহারাষ্ট্র ১৫ জন)। পাঁচ বছরের নীচে মেয়েদের মৃত্যুর হার গুটরাটে ৩৭ জন, যা জাতীয় গড় ৩৪-এর থেকে বেশী, যেখানে তামিলনাড়ুতে ২০ জন ও মহারাষ্ট্রে ২১ জন। এ থেকে বোঝা যায় বাচ্চা মেয়েদের স্বাস্থ্যর জন্য কিরকম অবহেলা ঐ রাজ্যে আছে। প্রসবকালীন মৃত্যুর অনুপাত (প্রতি ১০,০০০ জন্ম নেওয়া শিশুর মধ্যে) গুজরাটে ১২২ যা জাতীয় গড় ১৭৮ থেকে অনেক কম হলেও উন্নত সমমানের (?) রাজ্যগুলি থেকে অনেক বেশী। যা কেরলে ৬৬, মহারাষ্ট্রে ৮৭, তামিলনাড়ুতে ৯০।

সমৃদ্ধশালী বিজ্ঞাপিত গুজরাটে প্রায় ৫০ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। যা ছত্রিশগড়, মেঘালয়, ওড়িশার সাথে তুলনীয়। রাষ্ট্রসঙেঘর সংস্থা ইউনিসেফ এর ২০১২ সালে রাজ্যওয়ারি রিপোর্ট বলছে গুজরাটে পাঁচবছরের কম বয়সী শিশুদের প্রত্যেক দুজনের একজন অপুষ্টিতে ভুগছে। চার জনের তিন জন রক্তাল্পতায় ভুগছে। গত একদশকে শিশুমৃত্যু এবং মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার কমছে খুবই শ্লথ গতিতে। গুজরাটে প্রতি তিন মায়েদের একজন তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছেন?

(সূত্র : RHS 2012, MOHFW, SRS 2013, ORGI, GOI)

মানবোন্নয়ন সূচক : সর্বোপরি মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির নিরিখে মোদীর রাজ্য যোজনা কমিশনের তালিকায় ১৮ নম্বরে পড়ে আছে।

রক্তের দাগ হাতে লেগে আছে 'লৌহমানবের' আমরা জানি। কর্পোরেট দুনিয়া তথা সাম্রাজ্যবাদের ঘুঁটি আজ নরেন্দ্র মোদী। তার জন্য সমবেত প্রার্থনা— আমেরিকায় মোদীর ঢুকতে দেওয়ার বিধিনিষেধ তুলে দাও। প্রচারিত হচ্ছে গুজরাট ভারতের রোলমডেল। এমন রোলমডেল আমরা চাই? □

—মানস দাস

বাগাড়ম্বর সার

১০০ দিনের কাজে পিছিয়ে এই রাজ্য এগিয়ে থাকার শীর্ষে ত্রিপুরা

রাজ্যের যেখানেই মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন, সেখানেই বুলি আওড়াচ্ছেন উন্নয়নের। সময়সীমাভিত্তিক কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা সম্বলিত প্রশাসনিক ক্যালেণ্ডারও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এ সংক্রান্ত যা কিছু তথ্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের চিত্রই দুর্বল। বিভিন্ন খাতের বরাদ্দ অর্থের ব্যয় করা হয়নি একটা ভাল অংশই। তাছাড়া সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে 'রিপোর্ট টু দ্য পিপ্‌ল'। সেখানকার তথ্য বলছে (যা কিনা রাজ্য সরকারেরই পাঠানো) 'মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে' ১০০ দিনের কাজে কর্মদিবস সৃষ্টিতে 'পরিবর্তনের' এই রাজ্যের হার জাতীয় গড়ের থেকে অনেক পিছিয়ে। এ বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যে পরিসংখ্যান, তাতে পরিবার পিছু জাতীয় গড় যেখানে ৩৮, সেখানে এ রাজ্যের গড় মাত্র ২৬ দিন। রাজ্যে রেগায় ৫৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ১৬৬টি পরিবার কাজ চেয়ে পেয়েছেন ৪৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯৯০টি পরিবার। অর্থাৎ প্রায় ১১ লক্ষ ১৩ হাজার পরিবার কাজ চেয়েও কাজ পায় নি। যাঁরা পেয়েছেন তার প্রায় অর্ধেক পরিবার পেয়েছেন পনেরো দিনের কম কাজ। এ চিত্র কেবলমাত্র এ বছরেরই নয়, বিগত দু'বছরেও এ রাজ্য ছিল এব্যাপারে অনেক পিছিয়ে। নিম্নোক্ত চিত্রের দিকে তাকালেই তা পরিষ্কার হবে—

রাজ্য	২০১৩-১৪	২০১২-১৩	২০১১-১২
পশ্চিমবাংলা	২৬	৩৫	২৭
মহারাষ্ট্র	৪০	৫৪	৫১
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪২	৫৬	৫৯
রাজস্থান	৪৩	৫২	৪৭

(সূত্র ঃ টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের রিপোর্ট)

অথচ, বামফ্রন্ট শাসিত ছোটো রাজ্য ত্রিপুরা রেগার কর্মদিবস সৃষ্টিতে দেশের মধ্যে শীর্ষে। সেখানে গড়ে ৬১ দিন কাজ পেয়েছে পরিবারগুলি।

মাত্র কিছুদিন আগে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিং ঠিকমত দায়িত্ব পালন না করায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ভার তুলে দেওয়া হয় মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জীর হাতে। ২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রীদের কাজকর্ম পর্যালোচনার সভাতেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তীতে সুব্রত মুখার্জীকে যোগ্য দায়িত্ব পালনের জন্য দরাজ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। রাজ্যের অধিকাংশ পঞ্চায়েতই এখন শাসকদলের দখলে। ১৮টির মধ্যে ১৬টি জেলা পরিষদই তাদের দখলে। তৎসত্ত্বেও গরীব মানুষের স্বার্থবাহী রেগার কাজে এই রাজ্যের করুণ হালই বলে দিচ্ছে কেমন জনদরদী এই সরকার। □

পরমেশ দে

৩৪ বছরের অর্জিত সুফল চৌপাট ৩৪ মাসেই

পরিবর্তনের পর রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

সময়টা ২০০৭-০৮ সাল। সিঙ্গুরে টাটার ছোট গাড়ির কারখানা গড়ার জন্য প্রায় ১০০০ একর জমি অধিগ্রহণে রাজ্য সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে তৃণমূল কংগ্রেস। সরকার অনেক কম মূল্যে কৃষকদের জমি নিয়ে নিচ্ছে বলে ধুয়ো তোলে তৃণমূল কংগ্রেস। ঠিক সেই সময়েই সংবাদপত্রে একটি খবর প্রকাশিত হয় যে বিগত এন ডি এ-আমলে কয়লামন্ত্রী থাকাকালীন ই-এম-বাইপাসের ধারে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনেক কম দরে কিছু জমি অধিগ্রহণ করেছে মমতা ব্যানার্জীর কয়লামন্ত্রক, কয়লা শ্রমিকদের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল করবার জন্য। জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারটি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, সিঙ্গুর নিয়ে তৃণমূলের ধাপ্পাবাজি আজ মানুষের কাছে পরিষ্কার। আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। দশ বছরেরও বেশি হয়ে গেল, কিন্তু বাইপাসের ধারে কেউই ঐ হাসপাতালটি দেখাতে পারবেন না, কারণ পুরোটাই ছিল মিথ্যার বেসাতি, শ্যাওলান্যাস। বর্তমানে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে সেই মিথ্যাচারকে তিনি শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন।

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরপরই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে '২০০ দিনের কর্মসূচী' বলে একটি কাজের তালিকা প্রকাশ করা হয়। তার মধ্যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে ব্যাপারগুলি ছিল তা হল—

১। ১০টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ খোলা হবে।

২। ৫,০০০, ৩০,০০০ এবং ১২০,০০০ জন মানুষ পিছু এলাকায় যথাক্রমে সাব-সেন্টার, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

৩। প্রত্যেক মহকুমায় যাতে অন্তত একটা করে Multi Speciality Hospital-গড়ে ওঠে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

২০০ দিনের জায়গায় ১০০০ দিন হয়ে গেছে, কিন্তু এইসব প্রতিশ্রুতির শ্যাওলান্যাস পর্যন্ত হয়নি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হবার পরে ২০১১ সালের ৩০ জুন আঠেরোটি শিশুর মৃত্যু হয়েছিল বি.সি.রায় হাসপাতালে। তিনি জানিয়েছিলেন যে, যারা মারা গেছে, সেই সব শিশুদের খুব খারাপ অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছিল হাসপাতালে। ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা তাতে বলেন যে, 'তবে কি সুস্থ বাচচাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হবে?'

এরপর ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে চিকিৎসা পরিকাঠামোর অভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই ব্যাপকহারে প্রসূতি এবং শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

১৩ জানুয়ারি ২০১২ সালে হেলথ কার্ড থাকা সত্ত্বেও কলকাতার কোনো হাসপাতালে বেড না পেয়ে দুটি সন্তানের জন্ম দিয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যান উমা দেবী।

২০ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে বর্ধমান হাসপাতালে ৮ জন শিশুর মৃত্যু হয়।

৩০ জানুয়ারি, ২০১২তে কলকাতার বি.সি.রায় হাসপাতালে ৮টি শিশুর মৃত্যু হয়।

২০১২ সালের শুধু জানুয়ারি মাসেই মালদহ জেলা হাসপাতালে ১২১টি শিশু মারা গিয়েছে। এখানকার অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশীষ ভট্টাচার্য পরিকাঠামোগত দুর্বলতার কথা জানান।

১ এবং ২ ফেব্রুয়ারি,

(অষ্টম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে)

পরিবর্তনের জমানায় ‘দুঃশাসন’দের পুনরাগমন

গত২০১২-এর ৩১ ডিসেম্বর — মৃত্যু হয়েছিল দিল্লির ‘নির্ভয়ার’। বর্ষবরণের রাতে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন সমগ্র দেশবাসী। ২০১৩-এর ৩১ ডিসেম্বর — মৃত্যু হল মধ্যমগ্রামের ‘অপরাজিতার’। বর্ষবরণের রঙিন রাতকে তমসাচ্ছন্ন করে লজ্জায়, শোকে, ক্রোধে স্তব্ধ করল রাজ্যবাসীকে। এক বছর, কালের কপোলতলে এক বিন্দু অশ্রুসম। এই সময়কালে নির্ভয়ার মৃত্যুর পর অতি দ্রুততায় সাধিত হয়েছিল বর্মা কমিশনের রিপোর্ট, যদিও রিপোর্টের অধিকাংশই পরবর্তী আইনে প্রতিফলিত হয়নি, আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠেছে অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর বিচারের মাপকাঠি নিয়ে। এমনকি নারী সুরক্ষার লক্ষ্যে নির্ধারিত এক হাজার কোটি টাকার “নির্ভয়া ফান্ড” এখনও কার্যকর হয়নি, কোন্ পদ্ধতিতে তা ব্যায়িত হবে তার নির্দেশিকাও নিশ্চিত হয়নি। পরিহাসের বিষয় এতসবের পরেও বছর ভর একের পর এক ভয়ানক সংবাদ ভেসে আসছে। গেদে, গাইঘাটা খরজুনা, কামদুনি, বরানগর, খিদিরপুর মধ্যমগ্রাম...। এই সংবাদ শিরোনামের মিছিল প্রশ্ন ওঠায় : আর কত প্রতিবাদ পথ পার হলে তবে এক পা অগ্রসর হওয়া যায়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সি বি আই-এর শীর্ষকর্তা রঞ্জিত সিংহ প্রকাশ্য সভায় সকৌতুক মন্তব্য করেন “কথায় বলে ধর্ষণের মতো কাজ বন্ধ করতে না পারলে অন্ততঃ তা এনজয় করা উচিত।” তাঁর রসবোধ নিয়ে মন্তব্যের প্রয়োজন নেই, তবে কেন যে যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা ব্যবস্থা কিছু দূর অগ্রসর হয়েই তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে পড়ে, একা রঞ্জিত সিংহই বুঝি তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। হতবাক হই এই দেখে যে, রাষ্ট্র ও সমাজের উচ্চস্তরের দিকপালরা এমন ব্যবহার করতে পারেন, যে ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁদেরই নাকি সতত সংগ্রাম করার কথা ছিল।

আমরা জানি ক্রিকেট খেলায় একদল ব্যাট করে, একদল ফিল্ডিং করে এবং অন্য কোনজন আম্পেয়ারিং করে, তবেই খেলার আকর্ষণ থাকে ও উপভোগ্য হয়। কিন্তু যদি কোন একটি দলই ব্যাটিং, ফিল্ডিং, আম্পায়ারিং করে তাহলে সেই খেলায় কখনোই স্বচ্ছতা থাকে না, আকর্ষণীয় বা উপভোগ্যও হয় না। সেখানে ম্যাচ গড়াপেটা হতে বাধ্য। এমনই একটি গড়াপেটা ম্যাচ গত ৩৩ মাস ধরে আমরা মহিলাসমাজ তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসী দেখছি।

গত দুই বছর নয় মাস সময়কাল ধরে আমাদের রাজ্যে মহিলাসমাজ প্রতিদিন যেভাবে বিভিন্ন আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছে তা অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্ট হলেও একটু স্মরণ করতে বা করাতে চাইছি। আহা কত আশায় বুক বেঁধে আমরা একজন মহিলাকে মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আসীন করেছি। কি করে জানবো যে তিনি নিজে মহিলা হলেও রাজ্যের মহিলাদের মানসম্মান তাঁর দামাল দুষ্টু খোকাদের কাছে অকাতরে বিতরণ করেই তিনি পরমতৃপ্তি অনুভব করেন, মজা পান। সম্প্রতি তিনি (১২/৩/১৪) দিল্লির রামলীলা ময়দানে ফাঁকা মাঠে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন— “দেশ পরিচালনার জন্য কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হয়”— তার এক নম্বরে আছে — সুরক্ষা ও নিরাপত্তা। ভাবুন তো একবার — যে বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি রাজ্যের কর্ণধার হয়েছেন, সেই বিধানসভা ভবনের মধ্যে মহিলা বিধায়করা কি সুরক্ষিত? * মনে পড়ে— দেবলীনা হেমব্রমকে কিভাবে শাসকদলের মন্ত্রী-বিধায়করা চুলের মুঠি ধরে চ্যাংদোলা করে নির্যাতন করেছিল। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি চিটফাণ্ডের বিরুদ্ধে বলেছিলেন। * আমরা ভুলিনি কলেজের অভ্যন্তরে রাজ্যের সুপ্রিমোর দামাল দুষ্টুরা কিভাবে অধ্যাপিকাদের আক্রমণ করেছিল— কখনো জগ ছুড়ে মুখে মারছে, তো কখনো চুলের মুঠি ধরে টান দিচ্ছে। * আবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়লাভের পর আরেকটু অক্সিজেন পেয়ে গ্রামেগঞ্জে কর্মরতা মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীদের গায়ে কখনো পানের পিক্ ফেলছে, কোথাও বা তোলার টাকা না দিতে চাইলে বিধবা করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে, কখনও বা অশ্লীল গালাগালিসহ মারতে উদ্যত হচ্ছে তাদের পছন্দসই কাজ না করার জন্য বা তাদের দলে যোগ না দেওয়ার জন্য। * আর সুপ্রিমোর আদরের দুষ্টু অটোচালকরা তো ‘দিদি’র কাছ থেকে ভরপুর অক্সিজেন নিয়ে কোথাও ভাড়া সংক্রান্ত বচসায় মেরে তরুণীর নাক ফাটাচ্ছে, কোথাও রড মেরে যুবতীর মাথা ফাটাচ্ছে আবার কোথাও বা তরুণীর গলা টিপে ধরছে।

একসময়ে তিনি এই সমস্ত গুণ্ডা ভাইদের অনেক কন্ট্রোল করেছেন, আর ২০১১ সালের জুন মাস থেকে তিনি অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে একটু একটু করে তাদের মুক্ত করেছেন, এখন তারা সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর রাজ্য শাসনের সাফল্যের অন্যতম হল ‘নারী নির্যাতন’ শিরোপা অর্জন, এবং দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অর্জন করেছে। সেইজন্যই তিনি কাউকে বুদ্ধি ধার দিতে চান না, অবশ্য এইরকম বুদ্ধি ধার না নেওয়াই শ্রেয়। নির্যাতনের প্রথম শিরোপা, আর ‘ধর্ষণে’ দিল্লির পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান অর্থাৎ দ্বিতীয়-র শিরোপা। দিল্লিতে মেয়েরা নিরাপদ নয়, এটা জানা ছিল, কিন্তু মেয়েদের নিরাপত্তার বিষয়ে অতীতে পশ্চিমবঙ্গের একটা সুনাম ছিল। সেই সুনাম আজ ধুলায় লুণ্ঠিত। পার্কস্ট্রীট থেকে কামদুনি, মধ্যমগ্রাম থেকে আমতা, খরজুনা থেকে বনগাঁ, বনগাঁ থেকে বারাসাত, কালনা থেকে শিয়ালদা, কোচবিহার থেকে মুর্শিদাবাদ— বর্ধমান কোথায় নয়? সর্বত্র মা-মাটিই আজ ধর্ষিতা। উত্তরে দার্জিলিং-এর হিমালয় থেকে দক্ষিণে সাগর উপকূল, রাজ্যের সমগ্র ভুখণ্ড আন্দোলিত, ভয়ার্ত, দমবন্ধ করা এক পরিস্থিতি সর্বত্র

বিরাজমান। নারীর সম্মান আজ বাজারের পণ্য। দুষ্টু-দামালরা কোন বয়স মানছে না তাই মেয়েরা শুধু বাইরে নয় ঘরেও নিরাপদ নয়। সামাজিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, মানসিকভাবে কর্মস্থলে, ঘরে-বাইরে সর্বত্রই আজ নারীরা বিপন্ন। রাজ্যবাসী ভীতসন্ত্রস্ত কিন্তু দুষ্টু-দামালরা নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কারণ তারা নিশ্চিত তাদের উপর ‘দিদি’-র আশীর্বাদী হাত ও পুলিশ প্রশাসন আছে। নিষ্ঠুরতম ও বর্বরোচিত আক্রমণের নজির হিসাবে বলা যায় (যদিও এই স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়)।

* পার্কস্ট্রীট কাণ্ড — এই ন্যক্কারজনক ঘটনা সকলেরই মনে আছে। এই ঘটনার সাথে যুক্ত মূল অপরাধী কাদের খান এখনও ধরা পড়েনি ও বাকী দুষ্কৃতীরাও শাস্তি পায়-ই নি বরং তাদের অন্যায়কে প্রকাশ্যে তুলে ধরার জন্য মহিলা পুলিশ অফিসারকে পর্যন্ত শাসকদলের প্রশাসন অপেক্ষাকৃত অধঃস্তন পদে বদলী করে দেওয়া হয়, এটাও এক ধরনের মানসিক আক্রমণ। পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের আড়াল করতে শাসকদলেরই একজন মহিলা সাংসদের কুরুচিকর মন্তব্যও তাদের স্বরূপ উন্মোচিত করে। * কামদুনি কাণ্ড — এক কলেজ ছাত্রীর উদ্দাম স্বপ্নে ভরা যৌবন, গরিব খেটে খাওয়ার প্রতিদিনের খিদে থেকে মুক্তির সংগ্রাম। পড়াশুনা শিখে সুখের স্বাদের স্বপ্ন, এক চিলতে কুঁড়ে ঘরে চাঁদের হাসির বান ডাকার স্বপ্ন — স্বপ্নে ভরপুর মেয়েটির দোষ ছিল — টিপটিপ বৃষ্টিতে কলেজ থেকে একা বাড়ি ফিরছিল, আর তখনই দুষ্টু-দামালদের লোলুপ দৃষ্টি পড়লো এবং উন্মাদ হয়ে পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বীভৎসভাবে ধর্ষণ করে খুন করলো। এ বিষয়কে ধামাচাপা দিতে ও আসল দোষীকে আড়াল করতে রাজ্য সরকার মন্ত্রীসান্ত্রীদের পাঠিয়ে বাড়ির লোকদের অর্থের প্রলোভন দেখালো, চাকরির প্রতিশ্রুতি দিল, কারণ আসল দোষী একজন শাসকদলের ভোটলুটেরা। কোন দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে কেসটাকে লঘু করার অপচেষ্টা প্রত্যক্ষ করল সমগ্র রাজ্যবাসী। তাই চার্জশিট ও পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কামদুনি কোনো বিচার পায়নি। চাকরি দিয়ে, অর্থের প্রলোভনে কোন মায়ের বুকের হাহাকার কোনদিন বন্ধ করা যায় না। তাই এই অন্যায়ের যোগ্য জবাব দিতে হবে আগামী রাজনৈতিক সংগ্রামে।

* মধ্যমগ্রাম কাণ্ড — প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের মানুষ সামান্য একজন ট্যাক্সি চালক মেয়েকে ভালভাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল এরাজ্যে। সেই মেয়েকে দুষ্কৃতীরা ধর্ষণ করে ভয় দেখালো তার পরিবারকে এবং পাড়াছাড়াও করলো, তাতেও তাদের সাধ মিটলো না, একমাসের মধ্যে আবার ধর্ষণ করে মেয়েটিকে পুড়িয়ে মারলো। অবশেষে দুষ্কৃতীরা প্রশাসনের সহায়তায় মরদেহ আটকে দাহ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। যদিও সাধারণ মানুষের তীব্র প্রতিবাদে শেষমেশ তা হয়ে ওঠেনি। এইরকম ন্যক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী কিন্তু ৩৪ বছরের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। * লাভপুর ঘটনা — বিখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান বীরভূমের লাভপুর। লাভপুরের ‘কাহার সম্প্রদায়ের’ প্রেক্ষাপটে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন ‘হাঁসুলিবাঁকের উপকথা’। বাংলাকে তিনি সম্মানিত করেছিলেন আর নতুন প্রজন্মের দুষ্টু-দামালরা সৃষ্টি করলো নতুন ইতিহাস — আদিবাসী রমণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের নিদান — বা পশ্চিমবাংলার লজ্জা, পশ্চিমবঙ্গের গর্বের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পরিণত হলো খাপ পঞ্চায়েতে। মেয়েটির দোষ ছিল — সে ভিন্ন ধর্মের একটি ছেলেকে ভালবেসে সুখের ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল। আদিবাসী রমণী জানতো না যে বর্তমানে রাজ্যে স্বাধীনভাবে থাকার কোন অধিকার রাজ্যবাসীর নেই, রাজ্যের শাসকদল গণতন্ত্র নামক বিষয়টির গলা টিপে হত্যা করেছে। তাই তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালালো গ্রামের মোড়লসহ ১৩ জন দুষ্কৃতী। এক্ষেত্রেও প্রশাসনের ভূমিকা নীরব — পুলিশ কিছু করছে না কারণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোন অর্ডার নেই। বারে বারেই ৩৪ বছরের উদাহরণ দেয় অনেকে— কিন্তু ৩৪ বছরের বামরাজত্বে অধিকাংশ দুষ্কৃতীদের জেল বা শাস্তি হয়েছে।

* হাওড়ার মুক্তিরচকের ঘটনা ভোলা যায় না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকদলকে ভোট না দেওয়ার জন্য শাসকদলের দুষ্কৃতীরা শাশুড়ি ও পুত্রবধূকে একসাথে অমানবিকভাবে নখ-দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে আক্রমণ করেছে।

* এরাজ্যের বর্ধমান জেলা তো ধর্ষণের শীর্ষে বলা যায়— কাটোয়ার অম্বল গ্রামের ধর্ষিতা মহিলা তার উপর পাশবিক অত্যাচারের কথা জানালে মুখ্যমন্ত্রী অকাতরে বলে দিলেন সাজানো ঘটনা। মেমারীর ৬ নং ওয়ার্ডে দিনেদুপুরে এক কিশোরীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে শাসকদলের দুষ্কৃতীবাহিনী, আবার ৭নং ওয়ার্ডে তেরো বছরের এক কিশোরীকে দুষ্কৃতীরা একাধিকবার ধর্ষণ করে। ঘটনায় জড়িত দুষ্টু খোকাদের ধরে ফেলায় শাসকদলের পক্ষ থেকে ধর্ষিতার পরিবারকে ভয় দেখানো হয়। এছাড়াও মঙ্গলকোট, গোদার ঘটনাও উল্লেখযোগ্য।

উপরিউক্ত ঘটনাগুলির পরবর্তী প্রশাসনিক উদ্যোগগুলিও অর্থবহ। পার্ক স্ট্রীট —সাজানো ঘটনা, সরকারকে ম্যালাইন করা হচ্ছে। কাটোয়া — স্বামী বিরোধী রাজনৈতিক দল করেন। বারাসাত — মেয়েদের স্কার্টের সাইজ ছোট হলে সমস্যা। খরজুনা — এটি আসলে সহবাস। কামদুনি — প্রতিবাদীরা ‘মাওবাদী’। মধ্যমগ্রাম — রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হুমকি। এই খণ্ড চিত্রগুলি প্রমাণ করে অপরাধীদের আড়াল করার প্রশাসনিক তৎপরতা। তাই এই ধরনের অপরাধকে কেবলমাত্র অসামাজিক কাজ বলে চিহ্নিত করলে ফ্যাসিবাদের চরিত্রকে আড়াল করা হবে। স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের প্রকাশগুলোকে ঘৃণার আগুনে পরিণত করার মধ্যে দিয়েই আতঙ্কটাকে আতঙ্কসৃষ্টিকারীদের ঘরে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া মোকাবিলার অন্য কোন পথ নেই। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই একমাত্র পারে গণধর্ষণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিবাদ আন্দোলনের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার রাষ্ট্রীয় আক্রমণকে রুখে দিতে।

সম্প্রতি ঘোমটায় মুখ না ঢেকে ক্যামেরার সামনে এসে পার্ক স্ট্রীটের আক্রান্ত মেয়েটি বলেছে “আমি পার্ক স্ট্রীট ভিক্টিম নয়, পরিচিত হতে চাই নিজের নাম সুজেট দিয়ে। আমি অপরাধী নই তাই কেন মুখ ঢাকব আমি। লজ্জায় মুখ ঢাকুক অপরাধীরা — সমাজ”। এ আমাদের নতুন নারীর মুখ। হাজার অবমাননাতেও যার আত্মবিশ্বাস কেড়ে নেওয়া যায় না। আমরা চাই এই মনোবল থেকেই নারীর বাঁচার জগতে বিপ্লব আসুক এবং ক্লীব সমাজের জাগরণ ঘটুক। তাই নারীদিবসে আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক — “জীঁতু ইয়া হারুঁ, লড়াই করুঁ — কিঁউ কি জীনেকা ইয়ে এক হি তরিকা হ্যায়।” □

কুমকুম মিত্র, সুতপা হাজরা

শিলান্যাস না শ্যাওলান্যাস—সত্য কোনটি ?

● সাক্ষাৎ বরদাত্রীর মতো শিলান্যাস যাকে তিনি নিজেই শ্যাওলান্যাস বলে ফেলেছেন (সত্যিটা অন্যকে গোপন করার চেষ্টা করলেও নিজেকে গোপন করা যায় না।)

● রেলমন্ত্রী থাকার সময় অজস্র প্রকল্পের শিলান্যাস সবই শ্যাওলায় ঢেকেছে উদ্বোধনের মুখ দেখেনি। এমন যে নামগুলি শুনলেই এখন কানে আঙুল দিতে দেখা যাচ্ছে প্রচারকদের—তার কয়েকটি হল রেলের হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ, শালিমার অটো হাব, সিঙ্গুরে কিষাণ ভিশন প্রকল্প, নোয়াপাড়ায় মেট্রো কোচ তৈরির কারখানা, কাচরাপাড়ায় রেল কোচ ফ্যাক্টরি, ফুরফুরা শরিফ রেল, নিউ জলপাইগুড়ি রেল আক্সেল ফ্যাক্টরি, নন্দীগ্রামে জেলিংহ্যাম ওয়াগন ফ্যাক্টরি, কুলটির রেল ওয়াগন ফ্যাক্টরি, পুরুলিয়ার রেলের বিদ্যুৎ প্রকল্প ও কোচ কারখানা। দমদম-বারাসত মেট্রো ইত্যাদি ইত্যাদি।

● রাজ্যের কর্ণধার হয়েও প্রতিশ্রুতির বন্যা—প্রথম বছরের বাজেটে যা সব ছিল পরের বছর সবই প্রায় ভ্যানিশ। দ্বিতীয় বছর নতুন একপ্রস্ত প্রতিশ্রুতি আর শিলান্যাস। পরের বছরই সেগুলোর গতি কি হল তার কোনো হিসেব দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করেন না। নতুন বছরে আবারও একপ্রস্ত প্রতিশ্রুতি আর শিলান্যাস। এই খেলাই চলবে না কি প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য করা যাবে সেটাই ঠিক করবে এবারের নির্বাচন।

● বিধানসভার অধিবেশনের দিনসংখ্যা কমতে কমতে নামমাত্র হয়েছে (বছরে ৪০-৫০ দিন মাত্র) কাজেই কোনো সংসদীয় বিতর্কের সুযোগ নেই, কৈফিয়তের দায় নেই। দেশের মানুষের ভবিষ্যতের দায় তারা কিভাবে নেবে এটাই চিন্তা করার সময় এসেছে খেটে খাওয়া মানুষের কাছে।

প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির হালহকিকত ঃ

● নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে যেতে পারে এটা জেনেই উৎসব মঞ্চ বেঁধে গত ১ মার্চ ২০১৪ একই সাথে প্রায় ১৫০টি প্রকল্পের শিলান্যাস করে সর্বশেষ রোল মডেলটি ঘোষণা করেন। সেখানেই বক্তৃতায় বলেন বিউটিফিকেশন, সংখ্যালঘু উন্নয়ন, জঙ্গলমহল, পাহাড় এগুলোতে এই সরকারই মডেল সারা দেশে। সেখানে প্রকৃত অবস্থা কি সেটা

সেখানকার মানুষসহ রাজ্যবাসী টের পাচ্ছেন।

মডেলের হাল হকিকত ঃ

১। **বিউটিফিকেশন ঃ** পুরোনো রাস্তার ধারে রঙ (নীল সাদা), অন্য মালিকের দেওয়াল পর্যন্ত রঙ করে দেওয়া (যা ইতিমধ্যেই CAG এর নজর এসেছে), ত্রিফলা আলো নিয়ে কেলেঙ্কারি, আর গঙ্গাপাড় ইত্যাদি জায়গার সৌন্দর্যায়ন, রাস্তার মাঝে নতুন করে (পুরোনো ভেঙে) ডিভাইডার বানানো, রেলিং লাগানো। সবই উপরে রঙ চঙ আর ইঁহাকা মাল উঁহা, একেই বলে উপরে চিকন চাকন ভিতরে খড়ের গাদন।

২। **সংখ্যালঘু উন্নয়ন ঃ** পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০% পাল্টে সর্বোচ্চ মাত্রা ৫০% করা।

৩। **জঙ্গলমহল ঃ** ২৩টি ব্লক নিয়ে এই অঞ্চলের জন্য ঘোষণা ছিল প্রতি ব্লকে কিষাণমাণ্ডি হাবের— কোথাও হয়নি।

নয়াগ্রামে রেললাইন—হয়নি।

লালগড়ে রেললাইন—হয়নি।

প্রতি ব্লকে ৫০ জন করে কৃষক বন্ধু নিয়োগ—কোথাও হয়নি।

অনেকগুলি ব্লকে আইটিআই ঘোষণা—একটাও হয়নি।

মডেল স্কুল—হয়নি।

৭৫ হাজার কৃষি পেনশন—

পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র—

নতুন রেশন দোকান—

ঝাড়গ্রাম সহ রাজ্যে ৩৫টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল— কোথাও হয়নি। ঝাড়গ্রাম হেলথ সেন্টারে। জেলা হাসপাতাল বলে বোর্ড লাগানো ছাড়া, ২৬৫টি বেড যা আগেই ছিল, তার একটা সংখ্যাও বাড়েনি।

৪। **পাহাড়**— ওটা যে হাসছে সেটা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন তার হাসিটা যে পাগলা হাসি সেটা বুঝতে কারও অসুবিধা নেই।

● তবে এই মঞ্চে সেরা রসিকতা (!) হয়তো এটাই যে, তিনি ঘোষণা করেছেন গত আড়াই বছরে ১ লক্ষ ৯২ হাজার পাট্টা বিলি করেছেন। প্রকৃত তথ্য বিগত আড়াই বছরেই প্রায় ২৭,০০০ জনের পাট্টাদার এবং বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, যাদের জমির পরিমাণ প্রায় ৯৪০০ একর।

(অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

দেশ বিক্রি রুখতে পারে কারা

পরিস্থিতির বদল ঘটতে শুরু করে ২০০৪ সালে ইউ পি এ-১ সরকারের 'নিয়ন্ত্রক' হিসেবে বামপন্থীদের আত্মপ্রকাশ ঘটায়। উঠিয়ে দেওয়া হয় বিলগ্নীকরণ মন্ত্রক। সেই সরকারের উপর থেকে বামপন্থীরা সমর্থন তুলে নেওয়ার দিন পর্যন্ত এই মন্ত্রক চালু করার সাহস দেখায়নি ইউ পি এ-১। ঐ সময়ের শেষ দিকে কুখ্যাত আস্থা ভোটে জয়লাভ করার পর সরকার ফের শুরু করে দেশ বিক্রির কাজ। দ্বিতীয় ইউ পি এ-র সরকারের সময় থেকে পুরো ব্যাপারটাই লাগামছাড়া হয়ে পড়ে। এবারেও যোগ্য সঙ্গত দেয় সরকারের অন্যতম শরিক তৃণমূল দল। নীচের সারণী থেকে প্রমাণিত হবে একথা। প্রমাণিত হবে যে দেশ বিক্রিতে বামপন্থীরাই একমাত্র বাধা—

সাল	বাজেটে লক্ষ্যমাত্রা (কোটি)	খুচরা বিক্রয় (কোটি)	শেয়ার বিক্রয় (কোটি)	কৌশলগত বিক্রয় (কোটি)	অন্যান্য (কোটি)	বাকি বিক্রয় (কোটি)	মোট (কোটি)	প্রধান প্রধান কোম্পানী	সরকার	মন্তব্য
২০০৪-০৫	৪০০০	২৭০০	—	—	৬৪.৮১		২৭৬৪.৮৭	এন টি পি সি, ও এন জি সি, আই পি সি এল ইত্যাদি পূর্ব বিক্রয়ের জের	ইউ পি এ-১	নিয়ন্ত্রক বাম শক্তি
২০০৫-০৬	নেই	—	—	—	২.০৮	১৫৬৭.৬০	১৫৬৯.৬৮	ব্যাংক ইত্যাদির শেয়ার বিক্রি	ইউ পি এ-১	নিয়ন্ত্রক বাম শক্তি
২০০৬-০৭	নেই	—	—	—	—	—	—	—	ইউ পি এ-১	নিয়ন্ত্রক বাম শক্তি
২০০৭-০৮	নেই	১৮১৪.৪৫	—	—	—	২৩৬৬.৯৪	৪১৮১.৩৯	ব্যাংক ইত্যাদির শেয়ার বিক্রি	ইউ পি এ-১	নিয়ন্ত্রক বাম শক্তি
২০০৮-০৯	নেই	—	—	—	—	—	—	—	ইউ পি এ-১	নিয়ন্ত্রক বাম শক্তি
২০০৯-১০	নেই	২৩৫৫২.৯৩	—	—	—	—	২৩৫৫২.৯৩	এন এইচ পি সি, ও আই এল, এন টি পি সি, আর ই সি, এন এম ডি সি	ইউ পি এ-২	শরিক তৃণমূল
২০১০-১১	৪০০০০	২২১৪৪	—	—	—	—	২২১৪৪	এস জে ভি এন, ই আই এল, কোল ইন্ডিয়া ইত্যাদি	ইউ পি এ-২	শরিক তৃণমূল
২০১১-১২	৪০০০০	১৩৮৯৪.০৫	—	—	—	—	১৩৮৯৪.০৫	পি এফ সি, ও এন জি সি	ইউ পি এ-২	শরিক তৃণমূল
২০১২-১৩	৩০০০০	২৩৯৫৬.০৬	—	—	—	—	২৩৯৫৬.০৬	এন বি সি সি, এইচ সি এল, ও আই এল এন টি পি সি, নালকো ইত্যাদি	ইউ পি এ-২	শরিক তৃণমূল
২০১৩-১৪ (১৪ মার্চ পর্যন্ত)	৪০০০০	৭৪৭৭.৯৬	—	—	—	—	৭৪৭৭.৯৬	এম এম টি সি, এইচ সি এল, এন এফ এল, আই টি ডি সি প্রায় সমস্ত বড়ো কোম্পানী	ইউ পি এ-২	

সূত্র ঃ বিলগ্নীকরণ দপ্তর, ভারত সরকার

সংকলক উৎসর্গ মিত্র

শিলান্যাস

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

● নতুন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ নীতি ঘোষণা করে বিপুল প্রতিশ্রুতি অথচ বাজেটে গত বছরের বরাদ্দ প্রায় ৯০ কোটি থেকে কমিয়ে ৭০কোটি করা হয়েছে। ঘোষণা ছিল কিষাণ মান্ডির—এখন সেখান থেকে সরে এসে বলছেন কৃষক বাজার। ঘোষণা করেছেন ২১২টি ব্লকে এই বাজার হবে। প্রথম পর্যায়ে হবে ১৮১টা ব্লকে।

● কৃষিক্ষেত্রে ধারাবাহিক অধোগতি চলছে। পাটের উৎপাদন কমেছে, ধান ও আলুতে পূর্ববর্তী রেকর্ড ছুঁতে পারেনি। প্রায় ৯০ জন কৃষক ইতিমধ্যেই দেনার দায়ে আত্মঘাতী। নির্বাচনে প্রকৃত প্রসঙ্গ হবে জমির অধিকার, ফসলের ন্যায্য দামের অধিকার থাকবে কি থাকবে না।

● শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর ঘোষণা গত তিন বছরে ৩১টা কলেজ হয়েছে। SSK, MSK-র অন্তর্জলি যাত্রা হয়েছে। বাস্তবে এরকম নতুন কলেজ কিছু নির্মাণের পর্যায়ে আছে, চালু হয়েছে এমন অভিজ্ঞতা নেই। আর পার্শ্বশিক্ষকরা এখন পুলিশের লাঠিপেটা খাচ্ছেন। টেট-এর নামে যা চলছে তার ফল যুব কর্মপ্রার্থীরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। মেধা না আনুগত্য, কোনটা মাপকাঠি হবে এটাই আগামীতে ভাবতে হবে।

● ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পে ক্লাস্টার গঠনের ঘোষণা ছিল—বাস্তবে একটাও দিনের আলো দেখেনি। কোথাও কোথাও ছবি সংবলিত প্রকল্পের বোর্ড চোখে পড়ত তাও বর্তমানে ভ্যানিশ। চা এবং পাট শিল্প পুনরুজ্জীবনের প্রকল্পের বর্তমান হাল হল চা বাগানে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে। পাট শিল্পের রুগ্ণতার জন্য প্রায় ২৫০টি শিল্পের লক আউট হয়েছে।

● পুরুলিয়া সহ প্রায় জেলা সদর ঘিরেই বিমান বন্দরের ঘোষণা ছিল, কোথাও তার নামগন্ধ নেই। কোচবিহারে আগেই অনেকটা কাজ হয়েছিল সেখানে রঙ করে নিজের সাফল্য বলে চালানো ছাড়া নতুন কোনো বিমানবন্দর হয়নি।

● কলকাতা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে উত্তরপাড়া-কোতরঙে ফিল্ম সিটি বানানোর ঘোষণা ৬ জুন ২০১১-তে বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে গিয়ে। প্রকল্প কোথায়—সেখানে ইঁটভাটা রয়েছে বহাল তবিয়তে।

● রুগ্ণশিল্পে বা বন্ধ শিল্পের জমি পুনরুদ্ধার করে, শিল্পায়ন করার প্রতিশ্রুতি, ট্রাম কোম্পানির অধীনে থাকা রাজ্য সরকারের জমি যেগুলি খুবই দামী জায়গায় অবস্থিত, সেগুলিকে রিয়েল এস্টেট করার জন্য ঘনিষ্ঠদের হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোথাও একাজে কোনো হেলদোল নেই। উপরন্তু হলদিয়া সহ বহু শিল্পের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে এ রাজ্যের শাসক ঘনিষ্ঠ দামাল ছেলেরা।

● স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ১৫টি মেডিকেল কলেজ করা হবে, প্রাথমিক কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ঘাটতি মেটানো, প্রতিটি মহকুমায় ১টি করে মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল—সবই সাইনবোর্ডের পর্যায়ের উপরে ওঠে নি। অথচ না হওয়া মেডিক্যাল কলেজের (ঝাড়গ্রাম) আসন সংখ্যা বাড়িয়ে বলেছেন। স্বপ্নের পোলাওতে ঘি কম দেওয়ার দরকার নেই!

● বার্ধক্যভাতা, বিধবা ভাতা, গরিবদের সাহায্য প্রকল্প সবই বন্ধ। এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত প্রায় ১৮ লক্ষ বেকারের মধ্যে ১ লক্ষকে বেকারভাতা দেওয়া এবং ১৩ লক্ষকে ২০১৩ সালে এবং ২০১৪ সালে ১৫ লক্ষ বেকারের চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে সরকারী ঘোষণাকে ঠিক কি বলা যেতে পারে তার কোনো ভাষা আমাদের জানা নেই। ধর্ষণে ১ম স্থানাধিকার অর্জনের সাফল্য (!) পাওয়া এ রাজ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পের কথা বোধহয় এ রাজ্যের কেষ্টবিষ্টুদের মাথাতেই নেই।

● একমাত্র প্রচারে ব্যয় বরাদ্দ বেড়ে চলেছে হু হু করে। গত ২ বছরে প্রায় ১৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ কোটি টাকার বাজেট দাঁড়িয়েছে রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের। বিজ্ঞাপনের জন্য এই বিপুল ব্যয়ই প্রমাণ করে সত্যকে আড়াল করতে কি নিদারুণ অপচেষ্টার প্রয়োজন হয়। শ্রমজীবীরা জানে ধর্মের কল কিন্তু বাতাসেই নড়ে। অধর্মের কল নাড়াতে লাগে বিজ্ঞাপনের কুলোর বাতাস।

● সারদা কেলেঙ্কারিতেই এখনও পর্যন্ত ৩৫ জন এজেন্ট, আমানতকারী আত্মহত্যা করেছেন। ক্ষুদ্র সঞ্চয় শিকেয় উঠেছে আর বাজারী ঋণ গ্রহণে দেশের মধ্যে ১ নম্বরে যেতে উদ্‌গ্রীব এই রাজ্য সরকার।

● বিজ্ঞাপনের আর এক নোংরা উদাহরণ হল গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী যিনি আবার বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর পদপ্রার্থী। মোট উৎপাদন বৃদ্ধি এবং FDI টানাতে মডেল গুজরাট—যোজনা কমিশনের তথ্যেই দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে তার স্থান অনুন্নত রাজ্য ওড়িশা এবং ছত্তিশগড়েরও পিছনে। বৃহৎ রাজ্যগুলির মধ্যে মাথাপিছু আয়ে ৬ষ্ঠ, গরীব মানুষের সংখ্যায় ৫ম, মৃত্যুর গড় বয়সে ৮ম, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় ৬ষ্ঠ। গুজরাটের ৮০ শতাংশ শিশু এবং ৫৫ শতাংশ মহিলা রক্তাল্পতায় ভোগে, মানব উন্নয়ন সূচকে স্থান ১০ম।

● কেন্দ্রীয় সরকারই এখন প্রায় সমস্ত প্রকল্পের হোতা। সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীম (CSS) বা সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টান্স স্কীমের (CAS) মাধ্যমে প্রায় পুরো সামাজিক ব্যয় বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ করছে। রাজ্যগুলির ভূমিকা সেগুলি কার্যকর করা (Execution)। সেক্ষেত্রে মেগা প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম রেগা—সেখানে রাজ্য নামতে নামতে বর্তমানে ২৫ নং স্থানে, ইন্দিরা আবাস, রাজীব আবাস, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, স্বাস্থ্য মিশন, খাদ্য সুরক্ষা বিল, সর্বশিক্ষা মিশন, মা-শিশু স্বাস্থ্য বিধান প্রকল্প ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে বরাদ্দ অর্থকে নিজেদের সাফল্য বলে ঢাক পেটানো হলেও সাফল্যের মাপকাঠিতে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। ভারত সরকারের সাম্পেল সার্ভে এবং যোজনা কমিশনের তথ্যই এর প্রমাণ স্বরূপ জ্বলজ্বল করে এ রাজ্যকে বিদ্রূপ করছে।

● এ রাজ্যের সরকার নতুন কোনো রাস্তা বা বাড়ি তৈরি করা দূরের কথা যেগুলো ছিল সেগুলোকেই নীল সাদা রঙ করে নিজেদের সাফল্য বলে ঢাক বাজাচ্ছেন আর মিউনিসিপ্যালিটিগুলোকে ত্রিফলা লাইট লাগিয়ে আর গঙ্গার ঘাট / পাড় সংস্কার করে জওহরলাল নেহরু আরবান রিন্যুয়াল মিশন (JNNURM)-এর টাকায় মোচ্ছব করছেন। শহরে মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন দুর্ভোগ বাড়িয়ে সরকারী পরিবহন এবং পরিকাঠামোকে ধূলিসাৎ করে বেসরকারী রাঘববোয়ালদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করে চলেছেন এ রাজ্যটাকে। এই ভয়ঙ্কর অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হওয়া ঐতিহাসিক দায়।

● সংখ্যালঘু উন্নয়নে ১০,০০০ মাদ্রাসার প্রতিশ্রুতি ছিল, তার মধ্যে মাত্র ২৩৪ টার অনুমোদন মিলেছে আড়াই বছরে। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন মারফৎ শিক্ষকতার সুযোগ হারিয়ে গেছে, মৌলবাদীদের তৎপরতায় হাইকোর্ট কমিশনকে অসাংবিধানিক বলছে। চাকরি—সংরক্ষণের সব গল্পই আষাঢ়ে গল্পে পরিণত এটা সংখ্যালঘু শিক্ষিত যুবরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। সংখ্যালঘুদের স্বনির্ভর করার জন্য যে ঋণদান প্রকল্পগুলি ছিল তাও এখন দলতন্ত্রের যাঁতাকলে পড়ে যাই যাই করছে। □

অশোক রায়

বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

২০১২তে বাঁকুড়া এবং মালদহ জেলা হাসপাতাল ১৯টি শিশু মারা যায়।

এরকম ব্যাপকভাবে শিশুমৃত্যুর ফলে সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যখন তীব্র সমালোচনার মুখে ঠিক তখনই মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে সব শিশুরা মারা যাচ্ছে তারা গর্ভস্থ হয়েছিল বামফ্রন্ট আমলে। ফলে তাদের মৃত্যুর দায় পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারের। কতটা মানসিক অসুস্থতা থাকলে এ জাতীয় মন্তব্য করা যায়, তা গবেষণার বিষয় হতে পারে।

পরিকাঠামোগত অপদার্থতার ফলে প্রসুতি ও শিশু মৃত্যুর ঘটনা বারে বারে এরাজ্যে গত ৩৪ মাসে সংবাদের শিরোনামে আসছে। নীলরতন সরকার হাসপাতালে ট্রলির অভাবে একজন সন্তানসম্ভবা মাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার সময় তার সন্তানের প্রসব হয়ে যায় রাস্তায় এবং নবজাতকটি মারা যায়। অপর একটি ক্ষেত্রে প্রসবকালীন সময়ে নবজাতকের মাথা ছিড়ে বের হয়ে আসে চিকিৎসার গাফিলতিতে। এরকম অসংখ্য ঘটনায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে তার প্রমাণ।

স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের ব্যাপক শিশু মৃত্যুর প্রতিফলন ঘটছে কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যে। ডিসেম্বর, ২০১৩তে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক শিশু মৃত্যু নিয়ে যে সাম্প্রতিক রিপোর্ট বের করেছে তাতে তারা জানাচ্ছে এ রাজ্যে ২০১০-এ শিশু মৃত্যুর হার ছিল ৩১। ২০১২তে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৩২-এ। এই বৃদ্ধি যথেষ্ট আশঙ্কাজনক। এর ফলে এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১৫ থেকে নেমে ১৬তে এসে দাঁড়িয়েছে। সারা ভারতবর্ষে এই সময়কালে মাত্র তিনটি রাজ্যের ক্ষেত্রে শিশু মৃত্যুর হার বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাদে অপর দুটি রাজ্য হল উত্তর পূর্বাঞ্চলের অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরাম। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক শিশু মৃত্যুর হার। ভারতবর্ষের বৃহৎ রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই এ ব্যাপারে অধোগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আবার জননী শিশু সুরক্ষা যোজনায় অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর থেকে শিশুর বয়স এক বছর হওয়া পর্যন্ত মা ও শিশুর চিকিৎসার যাবতীয় ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সরকারী হাসপাতাল থেকে নিখরচায় দেওয়ার কথা। সরকারী তালিকা বহির্ভূত কোনও ওষুধ প্রয়োজন হলে রোগীকে তা হাসপাতালের ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে নিতে বলা হয়। সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল তার টাকা মেটায়। কোনও কারণে সেখানেও না পাওয়া গেলে হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ নিকটস্থ বেসরকারী দোকান থেকে তা কিনতে হয়। সেখানেও টাকা মেটায় সরকার। অথচ গত একবছরেরও বেশি হয়ে গেল এই খাতে রাজ্য সরকার ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে ৩৪ লক্ষ টাকা এবং চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি দোকানগুলিতে ১ কোটি টাকা বাকি রেখেছে। ফলে জননী ও শিশু প্রয়োজনীয় পরিষেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

পাশাপাশি এবছরের শুরুতে ঢাকঢোল পিটিয়ে রাজ্য সরকার একটি প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার বের করেছিল। সেই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে জলপাইগুড়ি, মালদহ, বহরমপুর, নদীয়া, সিউড়ি এবং মেদিনীপুরে 'মাদার এন্ড চাইল্ড হাব' শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরের সূত্রে জানা গেছে একটিরও কাজ শুরু হয়নি। উলুবেড়িয়াতে শেষ হবার কথা ছিল 'মাদার এন্ড চাইল্ড হাব'-এর কাজ, তাও হয়নি। প্রথম মাসে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনায় ১১ লক্ষ মানুষকে যুক্ত করার ঘোষণাও ছিল ক্যালেন্ডারে। কিন্তু কিছুই হয়নি এখনও পর্যন্ত।

যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের ৭০ শতাংশ মানুষের আশা ভরসার স্থল ছিল, গত ৩৪ মাসের ধাপ্পাবাজি আর মিথ্যাচারে তার এখন নাভিশ্বাস উঠছে। □

দৃষ্টি আকর্ষণী

কমরেড জ্যোতি বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি একটি স্মারক সংকলন প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এতদুপলক্ষে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা/অঞ্চল/ব্লক/সমিতির কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্বের সংগ্রহে থাকা ছবি/তথ্য কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা দিয়ে (অবশ্যই তা ফেরৎযোগ্য) সংকলন প্রকাশে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

— কেন্দ্রীয় কমিটি

বিনা মন্তব্যে বিনা মন্তব্যে বিনা মন্তব্যে

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশিত হইবামাত্র প্রার্থী-তালিকাও ঘোষিত হইতে শুরু করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যে দ্রুততায় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করিয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট, চটজলদি কোনও প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় তাহা নিরূপিত হয় নাই।... শাসক তৃণমূল কংগ্রেস জোর দিয়াছে বিভিন্ন ক্ষেত্রের 'তারকা'দের উপর। এই তালিকায় চলচ্চিত্র জগতের তারকাদের অনুপাত চমকপ্রদ। গায়ক, খেলোয়াড়, নাট্যকর্মীরাও আছেন। তামিল ও তেলেগু রাজনীতিতে রুপালি পর্দার কল্পলোক হইতে রাজনীতির মর্ত্যধামে অবতরণের যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে, বঙ্গদেশে ইতিপূর্বে তেমন ঐতিহ্য ছিল না। ইহা পরিবর্তন বটে। তারকাদের বা রাজনীতির বাহিরের বিশিষ্টদের গণতন্ত্রের মহাযজ্ঞে স্থান দেওয়ায় আপত্তির কারণ নাই। বরং জনপ্রতিনিধিত্বে মণ্ডিত হইলে এই সব তারকা গণতন্ত্রকে আরও বহুমুখী ও বর্ণময় করিয়া তুলিতে পারেন। কংগ্রেস এবং বিজেপির মতো বৃহৎ জাতীয় দল কিংবা সমাজবাদী পার্টির মতো প্রাদেশিক দল ইতিপূর্বে সংসদে রাজনীতি-বর্হিভূত বিশিষ্টদের প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাই বলিয়া দেয়, এ ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বাচনে এবং ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ সতর্ক থাকা জরুরি। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল সেই সতর্কতা রক্ষা করিয়াছেন কি? সংশয় গভীরে।... তৃণমূল কংগ্রেসের তালিকায় চোখ বুলাইলেই সেই সংশয় জাগিতে বাধ্য। প্রার্থীর যোগ্যতা বা অযোগ্যতা কোনও ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার নহে। তাঁহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে কতটা কৃতী, তাহাও এইখানে অপ্রাসঙ্গিক। সংসদীয় রাজনীতিতে কে কতটা অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবেন সেই বিষয়ে সুচিন্তিত ধারণার ভিত্তিতেই এই মনোনয়ন বাঞ্ছনীয়। মুখ্য প্রশ্ন সংসদের জন্য যাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের কয় জন নির্বাচিত হইলে সংসদীয় বিতর্কে আলোচনার মান উন্নত করিবেন? নিয়মিত উপস্থিত থাকিয়া রাজ্যের স্বার্থকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ঠিকঠাক প্রতিফলিত করিতে আগ্রহী বা সমর্থ হইবেন? অধুনা সংসদ বা প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে যে হট্টমেলা বসিয়া থাকে, যে অসংসদীয়, এমনকী অশালীন কটূক্তি, গালমন্দ, হাতাহাতি, ধাক্কাধাক্কি, চেয়ার-ছোড়াছুড়ি চলে, তাহা ভারতীয় গণতন্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করে নাই। তাহার ফলে আইনসভার প্রতি নাগরিকদের শ্রদ্ধাও বাড়ে নাই। অন্যদিক হইতে আইনসভা যদি উত্তরোত্তর ..... হাট হইয়া ওঠে তাহাতেও কিন্তু এই সভা নাগরিকদের শ্রদ্ধার্হ হইবে না। নূতন পথে হাঁটা ভাল, কিন্তু বেসামাল হওয়া ভাল নয়।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রথম সম্পাদকীয়, ০৭/০৩/২০১৪)

গোড়ায় জুটমিলের শ্রমিক। তার পরে সি পি এম ছাড়া ইসতক তৃণমূলের তৃণমূল স্তরের নেতা। সিঙ্গুরে জমি আন্দোলনের জেরে সেই বেচারাম মান্নাই এখন রাজ্যের মন্ত্রিসভার অন্যতম উদীয়মান তারকা। ছিলেন কৃষি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। সে তো রইলই, এক লাফে রাজ্যের তামাম ভূমির প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বেও চলে এলেন সিঙ্গুরের ভূমিপুত্র। সেই সিঙ্গুর, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার উড়ানে যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডানা দিয়েছিল। যেখানে আজও জমি ফেরত না-পেয়ে দিন গুনে চলেছেন 'অনিচ্ছুক' চাষিরা। বেচারামের সামনে এখন তাঁদের সেই প্রতীক্ষা আর মাথার উপরে 'বটগাছ' (বেচারামের ভাষায়) অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মজার কথা, রাজ্য যদি এখন জমি অধিগ্রহণ করতে চায়, দফতরের মন্ত্রী হিসেবে বেচারামকেই 'হাত ময়লা' করতে হবে।.... ন্যানো কারখানার জন্য নিজে এগিয়ে এসে জমি দিয়েছিলেন গোপালনগর সাহানাপাড়ার বিফল বাঙাল। এখন তিনি দোকান চালান। তাঁর কটাক্ষ, 'উনি তো মুকুট পরে নিয়েছেন। এবার জমি-জট খুলুন না। আমরা আমাদের জমিতে শিল্প হতে দেখি। নইলে জমি ফিরিয়ে দিন।'.... গোপালনগরের পলিটেকনিক ছাত্র, জমিদাতা পরিবারের অমিত সাহানার পাল্টা টিপ্পনী, "কী কাণ্ড। ছিলেন উনি জমি আন্দোলনের নেতা, হলেন অধিগ্রহণের মন্ত্রী। আর রাজ্যের শিল্পের তো এমন হাল, যে শিল্পমন্ত্রীই পাল্টে ফেলতে হল।" সিঙ্গুর স্টেশন লাগোয়া কেক-পেস্ট্রির দোকানে দাঁড়িয়ে গোপালনগর ঘোষপাড়ার এক অনিচ্ছুক চাষি (নাম প্রকাশেও অনিচ্ছুক) যোগ করেন, "বেচারাম তো আগেই মন্ত্রী হয়েছে। আমাদের হাল কি একটুও বদলেছে? বরং আরও খারাপ হয়েছে, হচ্ছে। বেল পাকলে কাকের কী?"

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭/১২/১৩)

সিঙ্গুরে তাপসী মালিকের নামাঙ্কিত কিষাণ মান্ডির উদ্বোধনে গরহাজির থাকলেন তার বাবা-মা। আর এই গরহাজির থাকার কারণ হিসেবে তাঁরা অভিযোগের আঙুল তুলছেন সিঙ্গুরের জমি-আন্দোলন পর্বের নেতা তথা বর্তমান মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকেই। দাবি করেছেন, বেচারামবাবু আমন্ত্রণ না জানানোতেই তাঁরা আসেননি। এ কথা উড়িয়ে দিয়েছেন বেচারামবাবু। শনিবার বিকেলে নবান্ন থেকে রাজ্যে যে চারটি কিষাণ মান্ডির উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় , তার মধ্যে রয়েছে সিঙ্গুরের রতনপুরের 'তাপসী মালিক কৃষক বাজার।'... ২০১১-র ডিসেম্বরে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সিঙ্গুরের বাজেমিলিয়ায় তাপসীর একটি মূর্তি বসানো হয়। অনুষ্ঠানে বেচারামবাবু ও মনোরঞ্জনবাবুকে দেখা গিয়েছিল। তা হলে এ দিনের অনুষ্ঠানে তাপসীর বাবা-মা অনুপস্থিত কেন? মনোরঞ্জনবাবুর অভিযোগ, "মুখ্যমন্ত্রী কৃষিমান্ডির নামকরণ মেয়ের নামে করায় আমরা গর্বিত। কিন্তু সিঙ্গুরের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেচারাম মান্নাই সব, তিনিই ঠিক করেন, কাকে নিমন্ত্রণ করা হবে আর কাকে হবে না। আমাকে ডাকা হয়নি। একটা ফোনও করা হয়নি। তাই যাইনি। "বেচারামবাবুর দাবি, "ওটা সরকারি অনুষ্ঠান। যেহেতু নবান্ন থেকে উদ্বোধন হল, তাই কার্ড ছাপানো হয়নি। সবাইকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। ওঁকেও বলা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আসেননি। সম্ভবত কারও প্ররোচনায় পা দিয়েই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন উনি। এটা দুর্ভাগ্যজনক।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ০২/০৩/১৪)

পুলিশের রিপোর্ট, বিভিন্ন পক্ষের আবেদন, সাক্ষীদের বয়ান-সহ নানান তথ্য জমা পড়েছে সাত বছর ধরে। হঠাৎ জানা গেল, কলিকাতা হাইকোর্টের হেফাজত থেকে নন্দীগ্রাম মামলার সেই সব কাগজপত্র নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে! নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলি চালানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ মামলার নথি উধাওয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্য দানা বেঁধেছে। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, সাত দিন অর্থাৎ, আগামী বুধবারের মধ্যে এই মামলার সমস্ত ফাইল পুনরায় পেশ করতেই হবে। .... নন্দীগ্রাম কাণ্ডের তদন্তে কতটা অগ্রগতি হয়েছে তা জানতে কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আলাদা একটি মামলা

করা হয়েছিল। সেই মামলায় অগের দিন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার নতুন করে সিবিআই তদন্তের আর্জি জানান। তাঁর বক্তব্য ছিল, সিবিআই যে-তদন্ত করেছে, তাতে রাজ্য সরকার সন্তুষ্ট নয়। অতএব কোর্টের ঠিক করে দেওয়া তদন্তকারী অফিসারকে দিয়ে নতুন করে তদন্ত করানো হোক।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭/০২/১৪)

কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালের শিশুবিভাগে জরুরি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ২ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করেছিল স্বাস্থ্যদপ্তর। কিন্তু সেই তালিকা থেকে সুপার স্পেশ্যালিটি এস এস কে এম হাসপাতাল-সহ কলকাতার প্রথম সারির তিন মেডিক্যাল কলেজ বাদ দেওয়ায় দফতরের অন্দরেই বিতর্ক তেরি হয়েছে। যেখানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় গুরুতর অসুস্থ শিশুদের নিয়ে আসা হয় সেখানেই যথেষ্ট যন্ত্র না থাকলে উপযুক্ত চিকিৎসা কী ভাবে হবে, উঠেছে সেই প্রশ্নও। এস এস কে এম-এর পাশাপাশি সরকারি টাকা পায়নি ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের শিশুবিভাগও। অথচ স্বাস্থ্যকর্তারাই মানছেন, গত প্রায় ১ বছর ধরে ওই হাসপাতালগুলি শিশুবিভাগের যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে দফায়-দফায় চিঠি দিয়েছে। ওই তিন হাসপাতালেই শিশুবিভাগের আওতায় 'সিক নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট' বা এস এন সি ইউ রয়েছে, যেখানে অতি সঙ্কটজনক শিশুদের পরিষেবার উন্নতমানের যন্ত্র দরকার। পাশাপাশি, প্রথম সারির মেডিক্যাল কলেজ হওয়া সত্ত্বেও এস এস কে এম ও ন্যাশনাল মেডিক্যালের এস এন সি ইউ-এ অক্সিজেন পাইপলাইন পর্যন্ত বসেনি! সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে ব্যবহার হচ্ছে সিলিন্ডারে ভরা অক্সিজেন।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ০৩/০২/১৪)

রাঙা-চোখের ছোঁয়াচ লেগেছে মফঃসলেও!

চোখ পাকিয়ে কথা কিংবা খুচরো নিয়ে অভব্যতা..অটো চড়লে চালকের এমন অভিজ্ঞতা ফিরে পাওয়া প্রায় দস্তুর হয়ে গিয়েছে আম-যাত্রীদের।

গত কয়েক দিনে কলকাতার অটো চালকদের ঔদ্ধত্য নিছক হুমকি-অসভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে মহিলা যাত্রীকে সজোরে থাপ্পর কিংবা লোহার রড দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও রয়েছে। এমনকী কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির গাঙ্গুলীবাগান এলাকায় মদ্যপ অটো চালকের বেপরোয়া গাড়ি চালানোর বলিও হয়েছেন এক প্রৌঢ়। কিন্তু শহর কলকাতার এই ধারাবাহিক ঘটনার আড়ালে চাপা

পড়ে গিয়েছে বিভিন্ন মফস্বলের অটো-কাণ্ড। তাতে অবশ্য হেলদোল নেই জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের। মালদহ থেকে আসানসোল, রাজ্যের উত্তর-দক্ষিণে বেশ কয়েকটি ঘটনায় অটো চালকের হাতে যাত্রী-হেনস্থার পরে অভিযোগ উঠেছে পুলিশি নিস্পৃহতা নিয়ে। থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে কোথাও যাত্রীদের শুনতে হয়েছে ডিউটি অফিসারের পরামর্শ, 'সামান্য ব্যাপার তো, মিটিয়ে নিন না।' অধিকাংশ জেলা প্রশাসনের কাছে হিসেবেও নেই পারমিট ও লাইসেন্স নিয়ে চলছে কতগুলি অটো কিংবা দৌরাত্মে ওই সব শহরে কী হারে বাড়ছে দূষণের মাত্রা। জেলা পরিবহণ দফতর এবং প্রশাসনের নির্বিকার মনোভাবের সুযোগ নিয়ে ওই শহরগুলিতে যথেচ্ছ ট্রাফিক নিয়ম ভেঙে, খুশি মতো রুট বদল করে, ভাড়া নিয়ে নিরন্তর জুলুম চালিয়ে এবং অবশ্যই যাত্রীদের কোথাও শাসিয়ে কোথাও বা চোখ রাঙিয়ে তাদের দাপট অব্যাহত রেখেছে অটো চালকদের একাংশ।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ০৩/০২/১৪)

খুব বাঁচতে চেয়েছিল মেয়েটি। তেরো দিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে চালিয়েছিল লড়াই। শেষমেশ তাকে হার মানতে হয়। ২০১২-র ২৮ ডিসেম্বর দিল্লির গণধর্ষণের মৃত্যুসংবাদে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল সারা দেশ। এক বছর বাদে, ২০১৩-র ৩১ ডিসেম্বর বেলা দেড়টা নাগাদ কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে মারা গেল মধ্যমগ্রামের গণধর্ষিতা কিশোরী। বারবার ধর্ষণ আর কুৎসার জ্বালা জুড়োতে যে কি না নিজের গায়ে আগুন লাগিয়েছিল, আট দিন আগে। প্রথম বারের গণধর্ষণের অভিযোগ থানায় জানানোর 'অপরাধে' ফের গণধর্ষণের শিকার হয় ওই ষোড়শী। পরিবারের অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা গ্রেফতার হওয়ার পরেও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ নিরন্তর হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল মামলা প্রত্যাহারের জন্য। বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছিল, ধর্ষিতার নামে রটানো হচ্ছিল নানা কুৎসা। এত অপমান আর নিগ্রহ সয়ে দরিদ্র ট্যাক্সিচালকের মেয়ে আর বাঁচতে চায়নি। আগুনে পুড়তে পুড়তে মাকে বলে গিয়েছিল, 'মা, আর বাঁচতে চাই না। তুমিও পুড়ে মরে যাও। তুমিও তো মেয়ে!' দিল্লির ঘটনার পরে দেশজোড়া ধিক্কার-প্রতিবাদ এবং তার জেরে ধর্ষণ-আইনের সংশোধন কিছুটা হলেও আমজনতাকে স্বস্তি দিয়েছিল। তাতেও কি ধর্ষকদের বাগ মানানো গিয়েছে? বছরের শেষ দিনে মধ্যমগ্রামের মেয়েটির মৃত্যু এই প্রশ্নটাই ফের তুলে দিয়ে গেল। আঙুল তুলল পুলিশি নিরাপত্তার কার্যকারিতার দিকেও। পরিবারের দাবি গণধর্ষণের অভিযোগ জানানোর পরে দুষ্কৃতীরা মেয়েটিকে 'বেয়াদপির শাস্তি' দিয়েছিল ফের গণধর্ষণ করে। তখন এলাকাবাসী, বিরোধী দল, এমনকী রাজ্য মহিলা কমিশনও পুলিশি সুরক্ষার গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। পরে ছয় অভিযুক্ত ধরা পড়ে, মেয়েটির বাড়ির সামনে পুলিশি প্রহরা বসে। কিন্তু ক'দিন পরে প্রহরা উঠেও যায় বলে পরিবারের দাবি। পরিজনেরা জানিয়েছেন, দুষ্কৃতীদের লাগাতার হুমকিতে ভয় পেয়ে মেয়েকে নিয়ে তার মা-বাবা মাসখানেক আগে মধ্যমগ্রামের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে এয়ারপোর্ট থানা-এলাকায় এক-কামরা বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন। তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। সেখানে গিয়েও শাসানি-অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই মেলেনি। পরিবারের অভিযোগ, মামলা তোলার হুমকিতে কাজ না-হওয়ায় পাড়ায় মেয়েটির নামে কুৎসা ছড়ানো শুরু হয়। এমনকী, ২৩ ডিসেম্বর তার বাড়িতে ভাঙচুরও চলে, সঙ্গে ফের শাসানি। আর তার পরেই সে চরম পথ বেছে নেয়। পারিবারিক সূত্রের খবর : হামলাকারীরা চলে যেতেই ঘরের দরজা বন্ধ করে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় ওই কিশোরী। তাকে আর জি কর-এ আনা হয়, সেখানকার ডাক্তাররা জানিয়েছেন, ওর শরীরের প্রায় ৬৫% পুড়ে গিয়েছিল। উপরন্তু একচিলতে ঘরে লাগানো আগুনের ধোঁয়া শ্বাসনালী দিয়ে ঢুকে ফুসফুসকে জখম করেছিল মারাত্মক।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ০১/০১/১৪)

নোনা হাওয়ায় ফিকে হয়ে গিয়েছে কটেজের পালিশের রং। বাংলো চত্বরে কেয়ারি করা বাগানেও অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি সেগুন কাঠ ও বেলজিয়াম কাচের কটেজের এখন এমনই হাল। গত বছর গঙ্গাসাগর মেলার আগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সাগর থেকে প্রায় ৬০ ফুট দূরে অনধিক দেড় বিঘা জমির উপর তৈরি হয় আগাগোড়া সেগুন কাঠের ওই কটেজ। যার ভিতরে রয়েছে বেলজিয়াম কাচের কারুকাজ। তৈরি হয় কটেজ লাগোয়া ওয়াচ টাওয়ার। কটেজের চারিদিকে বাতিস্তম্ভে লাগানো হয় হ্যালোজেন লাইট। কটেজের চারপাশে সবুজের ছোঁয়া আনতে পোঁতা হয়েছিল লক্ষাধিক টাকার বিদেশি ঘাস। কটেজে দুটি ঘর। দুটিই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। পুরো এলাকা ঘেরা শাল কাঠের খুঁটির প্রাচীর। কিন্তু এক বছর পর কয়েক কোটি টাকার ওই কটেজের চেহারায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের ছাপ স্পষ্ট। বহু জায়গাতেই চটে গিয়েছে পালিশ। ওয়াচ টাওয়ারের ছাদে বাসা বেঁধেছে চড়ুই। কটেজের চারিদিকের সবুজ ঘাসে হলদেটে রং ধরেছে। শুধু পালিশ নয়, সেগুন কাঠের দেওয়ালের গায়েও চিড় ধরেছে। শাল কাঠের খুঁটির দরজায় সব সময়ই তালা ঝোলে। সন্ধের পর অবশ্য নিয়ম করে হ্যালোজেন জ্বলে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮/১২/১৩)

ভুঁইফোঁড় অর্থলগ্নি সংস্থার সঙ্গে দলের নেতাদের একটি অংশের জড়িত থাকা নিয়ে এ বার ঘরে-বাইরে প্রবল অস্বস্তিতে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার সারদা গোষ্ঠীর কর্ণধার সুদীপ্ত সেনের নামে এফ আই আর দায়ের করা হয়। এর ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ওই সংস্থা এবং অন্যান্য ভুঁইফোঁড় অর্থলগ্নি সংস্থার সঙ্গে জড়িত দলীয় সাংসদ, নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দলের একাধিক নেতা মুখ খোলেন। দলের প্রথম সারির নেতাদের একাংশ বলছেন, "দলের যে সমস্ত সাংসদ, বিধায়ক বা মন্ত্রী বেআইনী চিট ফান্ডের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের অবিলম্বে বহিষ্কার করা দরকার। দলের ভাবমূর্তি ঠিক রাখতেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সর্বোচ্চ নেতৃত্বের।" দলের অন্দরে যখন এই অবস্থা, তখন কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির বাইরের রাস্তায় প্রতিবাদে বসেন ওই সংস্থার বেশ কিছু এজেন্ট। তাঁরা দাবি করেন, সংস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লগ্নিকারীদের রোষের মুখে পড়তে হবে তাঁদেরই। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের বাঁচানোর দায়িত্ব সরকারের। ..... প্রশ্ন উঠেছে, এত দিন বেআইনি ভুঁইফোঁড় অর্থলগ্নি সংস্থার বিরুদ্ধে দলীয় নেতৃত্ব চুপ ছিলেন কেন? এই বিষয়ে দলের প্রবীণ সাংসদ সোমেন মিত্র শুক্রবার বলেন, "বহু আগে থেকে আমি দলের ভিতর-বাইরে চিটফান্ডের রমরমা বন্ধের ব্যাপারে বলে এসেছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র ডায়মণ্ড হারবারের বহু গরিব মানুষ চিটফান্ডের পাল্লায় পড়ে সব হারিয়ে পথে বসেছে।" দলের আর এক সাংসদ শুভেন্দু অধিকারীও জানান, গত এক বছর ধরে তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গায় সভা করে ভুঁইফোঁড় সংস্থার বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করেছেন। কিন্তু তাঁর দলের কেউ কোনও পদক্ষপ করেনি বলে শুভেন্দু ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।... প্রতারিত সঞ্চয়কারীদের বাঁচানোর আর্জি জানিয়ে সোমেনবাবু কয়েক মাস আগে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহকেও চিঠি দিয়েছিলেন। সোমেনবাবুর কথায়, "আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলাম, চিটফান্ডের সঞ্চয়কারীদের বাঁচাতে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখা উচিত।" সেই চিঠি নিয়ে দলের অন্দরে বিতর্কও তৈরি হয়েছিল। সোমেনবাবু বলেন, "আমি মমতাকে বলেছিলাম, এখনই বেআইনি কারবার বন্ধ না হলে পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুর মিছিল হবে।" দলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, "চিটফান্ডের মালিক বা কর্তাদের সঙ্গে আমাদের অনেক নেতারই দহরম-মহরম। ফলে বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?"

(আনন্দবাজার পত্রিকা ২০/০৪/১৩)

(একাদশ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সমিতি সম্মেলন

গত ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি বর্ধমান শহরের কর্মচারীভবনে **পশ্চিমবঙ্গ সমবায় অডিটর্স এসোসিয়েশনের** ৩৬তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপণার মধ্য দিয়ে দুদিনের এই সম্মেলন সাফল্যের সাথেই অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রারম্ভে ১৭ জানুয়ারি রাত্রে শাসক দলের দুষ্কৃতীদের পক্ষ থেকে তাণ্ডব চালানো হয় প্রতিনিধি আবাসনে। এতদসত্ত্বেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বর্ধমান জেলার নেতৃবৃন্দ এবং সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সুযোগ্য পরিচালনায় অকুতোভয় প্রতিনিধিরা দৃঢ় মানসিকতার সাথে এহেন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে। সম্মেলনের প্রাক্কালে একটি দৃপ্ত মিছিল বর্ধমান শহর পরিক্রমা করে। দু'দিনের এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং 'সংগ্রামী হাতিয়ার'-এর সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ সহ করণীয় ব্যাখ্যা করেন। প্রতিনিধি আবাসনে দুষ্কৃতীদের হামলাকে সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করার জন্য অকুতোভয় প্রতিনিধিদের তিনি সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। প্রতিবেদন উত্থাপন করেন বিদায়ী যুগ্ম সম্পাদক ভাস্কর ভট্টাচার্য। সম্মেলনে উত্থাপিত প্রতিবেদন, আয় ব্যয় ও খসড়া প্রস্তাবাবলীর উপর আলোচনা করেন ৪৪ জন প্রতিনিধি। প্রতিনিধিদের আলোচনার উপর অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী জবাবী বক্তব্য রাখেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত ঘটক। দু'দিনের এই সম্মেলনে ১০ জন মহিলা সহ ১৪৭ জন প্রতিনিধি এবং ৪ জন মহিলা সহ ১২ জন দর্শক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির বর্ধমান জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক রঞ্জিত দত্ত। দ্বিতীয় দিন অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সম্পাদিকা সুস্মিতা বুট ব্যানার্জী।

সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত একটি প্রগতিশীল বুক স্টল থেকে ৩৫,০০০ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। সম্মেলন থেকে গৌতম ঘোষকে সভাপতি, সুশান্ত ঘটককে সাধারণ সম্পাদক, ভাস্কর ভট্টাচার্যকে যুগ্ম সম্পাদক, পার্থ চক্রবর্তীকে দপ্তর সম্পাদক, শুভাশিস ব্যানার্জীকে কোষাধ্যক্ষ এবং জয়দীপ সরকারকে মুখপত্র সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে ৬৭ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। দু'দিনের এই সম্মেলন সফলভাবে পরিচালনা করেন বিদায়ী সভাপতি স্বপন মল্লিক এবং বিদায়ী সহ সভাপতি খায়রুল আনমকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

গত ২৫-২৬ জানুয়ারি ২০১৪, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ঐতিহাসিক শহর বারুইপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল **পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের** ৬৩-৬৪তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন। একটি সংক্ষিপ্ত শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সমিতির অন্যতম সহ সভাপতি বিমল কুন্দগ্রামী। পরবর্ত্তীতে শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পনের পর সম্মেলনের কাজ শুরু হয়।

বিমল কুন্দগ্রামী, অসীম বেরা, রবিন কুণ্ডু, অসিত ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর শোক প্রস্তাব পেশ করেন অসীম বেরা। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি দীপক নাগ স্বাগত জানান। এরপর ৬৩-৬৪তম বার্ষিক সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য প্রদীপ নাগ। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক মানবেন্দ্র পাল। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ অমলেশ ধর। সম্মেলন মঞ্চে প্রস্তাব গুচ্ছ উত্থাপন করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক কমল দাম। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অপর যুগ্ম সম্পাদক অসিত রায়।

সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজীবন সদস্যপদ প্রদান সহ আটজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের শুরুতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বর্ষীয়ান নেতৃত্ব উৎপল সেনগুপ্তর মৃত্যু সংবাদ এলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও নীরবতা পালন করা হয়। দুদিন ব্যাপী এই সম্মেলনে মোট ৫২ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রাখতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখা, সম্মেলনে উপস্থিত সকলের হাতে স্মারক হিসেবে নেলসন ম্যান্ডেলার প্রতিকৃতি তুলে দেন।

প্রতিবেদনের উপর জবাবী ভাষণ দেন দিলীপ ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক। উত্থাপিত বিষয়গুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরিশেষে আগামী দুই বছরের জন্য ১২৪ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি দিলীপ ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র পাল, যুগ্ম সম্পাদকত্রয় অসিত রায়, তন্ময় মুখার্জী ও সুমন কান্তি নাগ, কোষাধ্যক্ষ অমলেশ চন্দ্র ধর, পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি সনৎ বেরা নির্বাচিত হন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা হয়। উল্লেখ্য যে সম্মেলনের বুকস্টল থেকে ৯০ হাজার টাকার বই প্রতিনিধিরা ক্রয় করেছেন। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সংগঠন **ওয়েষ্ট বেঙ্গল নন-মেডিকেল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের** ২৩তম রাজ্য সম্মেলন গত ২৫-২৬ জানুয়ারি, ২০১৪ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে কালেক্টরেট ক্লাব কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্মেলনের দিন সকাল ৯টায় এক সুদীর্ঘ উজ্জীবিত স্লোগান মুখরিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে। শহীদ স্মরণের পরবর্তীতে সম্মেলনের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। প্রলয় পাল, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য ও অশোক কুণ্ডুকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উত্থাপন করেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সমীর কুমার ব্যানার্জী। আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ শক্তিপদ জানা। প্রস্তাবাবলী উত্থাপন করেন শান্তনু ভট্টাচার্য্য ও মানস কুমার বড়ুয়া এবং সমর্থন করেন বাপ্পা দাস ও মলয় চক্রবর্তী। ১ জন মহিলাসহ ৪১ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। জবাবী বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক পল্লব দাস। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতভাবে ৮৩ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পদাধিকারসহ সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। বুক স্টল থেকে আগ্রহী প্রতিনিধিরা উল্লেখযোগ্য বই ক্রয় করেন।

পদাধিকার সহ নবনির্বাচিত সম্পাদকমণ্ডলী ২১ জনকে নিয়ে গঠিত হয় (আমন্ত্রিতসহ)— সভাপতি : প্রলয় কুমার পাল, সাধারণ সম্পাদক ঃ শান্তনু ভট্টাচার্য্য, যুগ্ম সম্পাদক ঃ বাপ্পা দাস। সংগঠন সম্পাদকঃ শক্তিপদ জানা ও শুভদীপ ঘোষ, দপ্তর সম্পাদক ঃ রাজেন্দ্র সিং, কোষাধ্যক্ষ ঃ বিশ্বজিৎ দত্ত, মুখপত্র সম্পাদক ঃ মলয় চক্রবর্তী। □

পশ্চিমবঙ্গ জনস্বাস্থ্য কারিগরী কর্মচারী সমিতি (টেক ও ননটেক) এর সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন গত ২৫-২৬ জানুয়ারি তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরস্থিত মোহনা বিল্ডিংয়ের সভাকক্ষে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্মেলনের প্রাক্কালে গত ২৫ জানুয়ারি '১৪ সকালে রক্তপতাকায় সুসজ্জিত একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বহরমপুর শহর পরিক্রমা করে সম্মেলনের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলে সভাপতি কালীপ্রসাদ লাহিড়ী কর্তৃক রক্তপতাকা উত্তোলন সহ নেতৃবৃন্দের শহীদ বেদীতে মাল্যদানের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়।

কালীপ্রসাদ লাহিড়ী, বিমল বিশ্বাস ও বিধুভূষণ মিত্রকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর সম্পাদক গোপাল পাঠক, পরে ১৭টি বাতি জ্বালিয়ে তিনি সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এরপর অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি তথা জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রমেশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উত্থাপন করেন সমিতির সংগঠন সম্পাদক অসীম কুমার গাঙ্গুলী, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শংকর চক্রবর্তী, খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অলোকতীর্থ রায় এবং সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অপর সংগঠন সম্পাদক বিষ্ণুপদ দাস মহাপাত্র। সম্মেলনে মোট ১২২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, এর মধ্যে ২০ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র আলোচনাকে গুটিয়ে এনে জবাবী ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক বেণুগোপাল দাস। সম্মেলন মঞ্চে গত ২৫/০২/১৪ তারিখ সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চাকুরী থেকে অবসর প্রাপ্ত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি সহ তিনজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

সম্মেলন থেকে তিন জন আমন্ত্রিত সদস্য সহ ১৬ জনের সম্পাদকমণ্ডলী এবং ৫২ জনকে নিয়ে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন থেকে আগামী কার্যকালের জন্য নির্বাচিত পদাধিকারী যথাক্রমে সভাপতি বেণুগোপাল দাস, সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার গাঙ্গুলী, যুগ্ম সম্পাদক বিষ্ণুপদ দাস মহাপাত্র, দপ্তর সম্পাদক শংকর গাঙ্গুলী, কোষাধ্যক্ষ শংকর চক্রবর্ত্তী এবং সমিতির নিউজ বুলেটিনের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বেণুগোপাল দাস।

এছাড়াও সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত বুক স্টল থেকে প্রতিনিধিরা পুস্তক ক্রয় করেন। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশন-এর ৩৯-৪০তম রাজ্য সম্মেলন ১-২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ যাদবপুরের বিজয়গড় নিরঞ্জন সদনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রক্তপতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ-সভাপতি চন্দন ঘোষ। প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা মিনতি ঘোষ। প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সভাপতি সুব্রত গুহ এবং সম্পাদিকা নিবেদিতা দাশগুপ্ত। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদিকা গীতা দে। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ কৃষ্ণা বসু। খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন কণিকা দত্ত ও নমিতা রায় এবং সমর্থন করেন দূর্গা রায় ও নিবেদিতা দাশগুপ্ত। সম্মেলনে ১৮টি জেলা ও ৫টি অঞ্চল থেকে ৪২২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উত্থাপিত বিষয়গুলির ওপর ৪০ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেছেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সকালে দক্ষিণ কলকাতার নেতাজীনগর থেকে শুরু করে প্রতিনিধিবর্গ ও আমন্ত্রিতদের সম্মিলিত এক বর্ণাঢ্য মিছিল বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে সভাপ্রাঙ্গণে শেষ হয়। সম্মেলন উপলক্ষে সংগঠনের মুখপত্র 'সেবাব্রতী'-র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহ। প্রতিবেদনের ওপর জবাবী ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শিখা মুখার্জী। সম্মেলন থেকে সভাপতি পদে শিপ্রা ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদিকা পদে গীতা দে, কোষাধ্যক্ষ পদে কৃষ্ণা বসু, পত্রিকা সম্পাদিকা পদে কুমকুম মিত্র সহ ১৩২ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ২২ জনের সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়।

উল্লেখ্য এই সম্মেলন উপলক্ষে প্রগতিশীল বুক স্টলের আয়োজন করা হয়েছিল। ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় এই স্টলের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য। বুক স্টল থেকে আনুমানিক ৪০,০০০ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। □

> এই সময়কালে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি'১৪) অন্যান্য যে সমিতিগুলির রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট এপ্রিল ২০১৪ সংগ্রামী হাতিয়ারে প্রকাশিত হবে।
>
> — *পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী*

যৌথ কনভেনশন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ করা হবে।

প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ওঃবেঃগভঃ এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন (নব পর্যায়)-এর পক্ষে সমীররঞ্জন মজুমদার, আশা-র পক্ষে সৌমিত্র গুহ, যুক্ত কমিটির পক্ষে দীপঙ্কর বাগচী, জয়েন্ট কাউন্সিলের পক্ষে রাহুল মুখার্জী, স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষে প্রবীর রায় এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে মনোজ কান্তি গুহ। তিনি বলেন শুধুমাত্র কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার এ রাজ্যে আক্রান্ত নয় সামগ্রিকভাবে রাজ্যবাসীর গণতন্ত্র হরণ করে নিয়েছে রাজ্য সরকার। অনেকে বলছেন লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক কারণে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা বলছি মহার্ঘভাতার দাবি, কর্মচারীদের অধিকার রক্ষার দাবি, কর্মচারীদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে যৌথভাবে সরব হওয়া যদি রাজনীতি হয়— তবে সেই রাজনীতি অবশ্যই আমরা করছি এবং আগামী দিনেও করবো। রাজ্য সরকারি যদি আমাদের কথা না শোনেন তাহলে এই সংগঠনগুলি পুনরায় বসে আগামীদিনে আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে। প্রয়োজনে জনস্বার্থ বিরোধী কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী এই সরকারকে আমরা পাল্টে দেবার জন্য লড়াই সংগ্রাম গড়ে তুলবো। অপরাপর বক্তারাও রাজ্য সরকারের কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী নীতি ও অগণতান্ত্রিক আচরণের তীব্র সমালোচনা করেন।

যৌথ কনভেনশনের ৯ দফা দাবি দ্বাদশ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হল

এই কনভেনশনের জন্য কলকাতায় অন্য কোনো বড় হল না পাওয়ায় মুসলিম ইনস্টিটিউট হলের তিন তলায় এবং গেটের কাছে যে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের জন্য স্ক্রিনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কর্মচারীদের ঢল ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য উদ্যোক্তা সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। এই কনভেনশনের সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে অশোক পাত্র বলেন আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে নিজস্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে পরাস্ত করতে হবে। সভায় সর্বসম্মতভাবে উত্থাপিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। □ **সুব্রত গুহ**

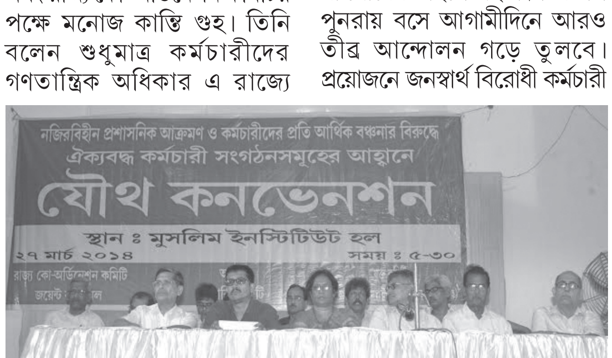

কনভেনশনের মঞ্চে নেতৃবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। ১৮৪৮ সালে প্রুশিয়ার সম্রাট নারীদের ভোটাধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রাখেন নি।তাই প্রতিবাদী প্রতীক হিসাবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর ১৯১১ সালের ১৯ মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস হিসাবে পালন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কের দর্জি মেয়েরা নারীর ভোটাধিকারের জন্য যে ঐতিহাসিক আন্দোলন শুরু করেছিল, তাকে স্মরণ করেই ৮ মার্চ সমানাধিকারের লড়াইয়ের প্রতীক দিবস হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে।

সারাবিশ্ব, দেশ তথা রাজ্যে প্রতিবছর এই দিনটিকে যেমন স্মরণ করা হয়, তেমনি আমরা কর্মচারী সমাজও এই দিনটি শ্রদ্ধার সাথে উদ্‌যাপন করি। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে, কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির পরিচালনায়, ৮ মার্চ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভা কক্ষে এই দিনটিকে শ্রদ্ধায় স্মরণে প্রতিপালন করা হয়। সভা পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা কমরেড ছবি ঘাটা হালদার। মহিলা উপসমিতির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়িকা কমরেড শিখা মুখার্জী তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে তুলে ধরেন বর্তমান পরিস্থিতিতে আজকের দিনের গুরুত্ব। আদিমযুগ থেকে নারীরা বিভিন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে যেভাবে লড়াই আন্দোলন করেছে, তা আজও জারি আছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে প্রত্যাশা নিয়ে রাজ্য আন্দোলনের সর্বোচ্চপদে একজন মহিলাকে আসীন করেছিল, কার্যত তা পূরণ হয় নি বরং মহিলাদের সম্মান হানী, অমর্যাদা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, এই সময়ে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে— প্রতিবাদ প্রতিরোধকে গণপ্রতিরোধের আকারে নিয়ে যেতে হবে। সংগঠনের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শকে মাথায় রেখে রাজনৈতিক লড়াইকে বিবেচনা করতে হবে এবং ভয়কে জয় করে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই সভার

সভায় উপস্থিত মহিলা কর্মচারীদের একাংশ

প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য নেতৃত্ব কুমকুম চক্রবর্তী। তিনি উল্লেখ করেন—একটা অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে আমরা দিন যাপন করছি। প্রায় ৩৩ মাস এরাজ্যে শাসকদলের নৃশংস চেহারা আমরা অনুভব করছি, যার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে মত বিনিময় করতে হবে। আরো ব্যাখ্যা করেন ৮ মার্চের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। যে সমস্ত দাবীগুলি নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, ক্রমশ সেই দাবীগুলি যেন শাসকশ্রেণী ফিকে করে দিচ্ছে।শ্রমজীবী মানুষের অধিকার অর্জনের জন্য প্রায় ১০৪ বছর ধরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হচ্ছে, কিন্তু বর্তমান শাসকদল সেই অর্জিত অধিকারগুলি হরণের প্রচেষ্টায় রত। তিনি উল্লেখ করেন শ্রমজীবী মানুষের উপর পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের প্রভাব, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চমকদারী বিজ্ঞাপনী প্রলোভন-যে ফাঁদে আমারাও নিজেদের অজান্তে জড়িয়ে পড়ছি। সবাইকে মোহগ্রস্থ করে রাখছে, যেন একই দেশে ধনী ও দরিদ্র দুটি ব্যবস্থাকে কায়েম রাখা যায়। নিকৃষ্টতম পরিবর্তনের রাজ্যে মহিলাদের অবস্থান তিনি তুলে ধরেন। এরাজ্যে গত ৩৩ মাস ধরে যেভাবে নারী নির্যাতন, নারীদের সম্মানহানী, ধর্ষণ ইত্যাদি বেড়ে চলেছে এবং একজন মহিলা হয়ে মহিলাদের নির্যাতনকারী 'দুষ্টু' 'দামালদের' তিনি যেভাবে আগলে রাখছেন তাতে আগামীদিনে মহিলাসহ এরাজ্যবাসীর অবস্থা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। গরীব মানুষের টাকা লুট করে (সারদা-সাহারা ইত্যাদির মাধ্যমে) রাজ্যে উৎসবের ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন, দুর্নীতিতে ভরিয়ে দিচ্ছে তাঁর প্রশাসন এ রাজ্যকে। তিনি মা-মাটি মানুষের কথা বলেন, অথচ মাটির গন্ধ যাদের নাকে যায় না, সাধারণ মানুষের কথা যাদের কানে যায় না সেইরকম দশজন তারকাকে বেছে নিয়েছেন আগামী লোকসভা নির্বাচনে তাঁর দলের প্রার্থী হিসাবে, তারা নাকি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে যাবেন দিল্লীর দরবারে। তাই শিক্ষিত সমাজের মূল্যবান অংশ হিসাবে আমাদের আপনাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। ভয় পেলে হবে না—ভয়কে জয় করেই এগোতে হবে। আজকের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আহ্বান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে দারিদ্র, ক্ষুধা, কর্মসংস্থান, শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে আমাদের সংগ্রাম জারি থাকবে, এই সংগ্রামকে আমাদের সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অতঃপর সভানেত্রীর সমাপ্তি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘটে। □ **কুমকুম মিত্র**

বিনা মন্তব্যে

বিনা মন্তব্যে

বিনা মন্তব্যে

(নবম পৃষ্ঠার পর)

দিল্লির দিকে আঙুল তুলে রাজ্যের দাবি : একশো দিনের কাজ প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা তাদেরই দেওয়ার কথা কিন্তু এখন কাজ হয়ে গেলেও কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিযোগ। অন্য দিকে পুরো ঘটনার দায়ভার রাজ্যের উপরে চাপিয়ে দিল্লি বলছে, পশ্চিমবঙ্গে এ বছর প্রকল্পটিতে যা কাজ হয়েছে, তার পাই-পয়সা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকী, অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গকে বাড়তি সুবিধাও দেওয়া হয়েছে বলে দিল্লির দাবি। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের মতে, আগের বছরের বকেয়া মেটাতে গিয়ে এ বছরের টাকা খরচ করে পশ্চিমবঙ্গ সমস্যায় পড়েছে। তারই দায় দিল্লির ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা চলছে।

আর এই টানাপোড়েনের মাঝে বকেয়া মজুরি মেটানোর দাবিতে বিভিন্ন গ্রামে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে বলে পঞ্চায়েত দফতর-সূত্রের খবর। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের মুখে এ হেন অসন্তোষের আঁচ পেয়ে নবান্নও বিব্রত। রাজ্য প্রশাসনের একাংশ এর মধ্যে সিঁদুরে মেঘও দেখছেন। ‘‘বকেয়া এখনই ৮০০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। মার্চের শেষে হাজার কোটিতে পৌঁছাবে। জানি না, কী ভাবে সামলাব!’’ বলেছেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তাঁর আশঙ্কা, ‘যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা কোদাল-বেলচা নিয়ে পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে না-বসেন।’’ এখন উপায়?

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬/০৩/১৪)

আরাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে লিখিত অভিযোগ জানালেন ভাঙড়ের নারায়ণপুর হাইস্কুলের সেন্টার ইনচার্জ গোপা রায়। তবে এই অভিযোগের ভিত্তিতে এখনই তদন্ত হচ্ছে না। সংসদ সভাপতি মহুয়া দাস শনিবার জানান, ২৮ মার্চ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে ওই ঘটনার তদন্ত হবে। কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রে বহিরাগত ঢুকে পড়া, সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলার জেরে গোপাদেবীকে শো-কজ করা হতে পারে বলে এ দিনই জানিয়ে দিয়েছেন সংসদ সভাপতি মহুয়া দাস। শুক্রবার উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরাজি পরীক্ষা চলার সময় ও্ স্কুলে ঢুকে আরাবুল পরীক্ষার্থীদের নির্ভয়ে পরীক্ষা দিতে বলেন এবং কিছু না পারলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা উত্তর বলে দেবেন বলেও তাদের আশ্বাস দেন বলে অভিযোগ। গোপাদেবীকে গালাগালি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে তৃণমূলের ওই নেতার বিরুদ্ধে। আরাবুল অবশ্য শিক্ষিকাকে গালি দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, পরীক্ষা কেন্দ্রে সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক আছে কি না, তা দেখতেই সেখানে গিয়েছিলেন, মিথ্যে অভিযোগে তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে বলে অভিযোগ আরাবুলের। যদিও পরীক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে কোনও ভাবে যুক্ত না হয়েও পরীক্ষা চলাকালীন তিনি ব্যবস্থাপনাই বা দেখতে ঢুকলেন কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জবাবে শনিবার আরাবুল শুধু বলেন, ‘‘আমি ভাঙড়-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।’’

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬/০৩/১৪)

বিড়ম্বনার পর এবার বিতর্ক। দিল্লির রামলীলা ময়দানের সভা ‘ফ্লপ’ হওয়ার পর প্রার্থীতালিকা নিয়ে বিতর্কে জড়াল তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভা নির্বাচনে এ বারই প্রথম ভিনরাজ্যে প্রার্থী দিচ্ছে তারা। ঘটনাচক্রে, সেই প্রার্থীদের নিয়েই বিস্তর বিতর্ক। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের প্রার্থীতালিকায় এমন সব ব্যক্তি ঠাঁই পেয়েছেন যাঁদের বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতি, তোলা আদায়, বিদেশে অর্থপাচারের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তালিকায় রয়েছেন এক প্রাক্তন মাওবাদী কম্যান্ডারও। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করেন , আসন্ন নির্বাচনে রাজ্যের বাইরে সাফল্যের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ঝাড়খণ্ডে। সেখানকার চারটি আসনে ইতিমধ্যেই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের নেতারা বলছেন, অন্তত দু’টিতে জয় একপ্রকার নিশ্চিত। কিন্তু প্রার্থীদের ‘বায়োডেটা’ দেখে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। পালামৌ কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে কামেশ্বর বৈঠার নাম ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাওবাদীদের প্রাক্তন জোনাল কম্যাণ্ডার কামেশ্বরকে এ অঞ্চলে সবাই একডাকে চেনেন। বলা হয় নেতা, পুলিশ বা সাধারণ মানুষ... তাঁকে ডরায় সবাই। আবার রবিনহুড ইমেজের জন্য জনপ্রিয়তাও নেহাত কম নয়। মূলত তার ভিত্তিতেই গত লোকসভা ভোটে ঝাড়খণ্ড জনমুক্তি মোর্চার টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন। ২০০৯-এ তিনিই

ছিলেন একমাত্র প্রার্থী, যিনি বিহারের জেলে বসে জয়ী হয়েছিলেন। সে সময়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে তিনি যে হলফনামা পেশ করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে ৫৩ টি ফৌজদারি অপরাধের মামলা রয়েছে। মাওবাদী কমাণ্ডার থাকার সময় মোট ১৭ জন জওয়ানকে নৃশংস ভাবে খুন করার অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। ঝাড়খণ্ডের এক ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারকে খুনের অভিযোগও রয়েছে। সে জন্য দীর্ঘ দিন জেলে কাটিয়েছেন কামেশ্বর। ২০১১ সালে তিনি জামিনে মুক্তি পান। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ কামেশ্বর বৈঠা গতবার পালামৌ থেকে জয়ী হলেও , এ বার তাঁকে টিকিট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় দল। তার পরই নতুন দল খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন তিনি। প্রথমে ঘোষণা করেছিলেন, পুরোনো দলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে বিজেপি-তে যোগ দেবেন। কিন্তু বিজেপি তাঁকে নিয়ে বেশি আগ্রহ না দেখানোয় শেষ পর্যন্ত তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

(এই সময়, ১৪/০৩/১৪)

বিস্তর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শেষপর্যন্ত নিজেই এলেন না আন্না হাজারে। রামলীলা ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আন্না হাজারের যৌথ সভায় গুটিকতক লোক বসে স্রেফ ঝিমোলেন। এর থেকে বেশি লোক মমতার বাড়ির সামনেই হররোজ ঘোরাফেরা করে। ফলে, মমতার গোবলয়ে ঢোকার স্বপ্নে গোচোনা ফেলে দিলেন স্বয়ং আন্নাই। মমতা দিন কয়েক আগেই ঘোষণা করেছিলেন, আন্না যেখানে বলবেন সেখানেই প্রার্থী দেবেন। সভা ব্যর্থ হওয়ার পর বিরক্ত মমতা সাংবাদিক বৈঠকে বললেন, ‘আমরা রাজনৈতিক ভাবে একাই লড়ব। বাংলায় তো পঞ্চায়েত থেকে একা লড়েছি।’ আন্না ডেকেছিলেন বলেই তিনি শত কাজ ফেলে এখানে এসেছিলেন তা জানাতে ভোলেননি মমতা। এ-ও বলেছেন, চাইলে তিনি দু’দিনে রাজ্য থেকে লোক এনে রামলীলা ভরিয়ে দিতে পারতেন। আন্না ও মমতার দু’জনেরই এই সভায় বলার কথা ছিল। কিন্তু কেন এলেন না আন্না? বলা হচ্ছে, মহারাষ্ট্রের গরম থেকে দিল্লির ঠাণ্ডায় এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবে সূত্রের খবর, লোক এত কম দেখেই আন্না আসেননি। আন্না আসবেন না জেনে লোক আরও কম এসেছে। মুকুল রায়কে পাঠিয়েও আন্নাকে আনা যায়নি। একে লোক নেই, তার উপর আন্নাও নেই, দিল্লিতে এই দুই ধাক্কার জেরে প্রবল অস্বস্তির মুখে পড়তে হল তৃণমূল নেত্রীকে। শেষ পর্যন্ত মমতা একাই ভাষণ দিলেন। দিল্লিতে নিজের ও আন্নার শক্তিপ্রদর্শন দূরে থাক, জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূল নেত্রীর বার্তা পাঠাবার কাজটাও ভেস্তে গেল। প্রশ্ন উঠল, আন্না হাজারের সঙ্গে মমতার জোট নিয়েও। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কখনও বোধহয় এত কম লোকের জনসভায় মমতা ভাষণ দেননি। জনসভা শুরুর সময় ছিল বেলা এগারোটায়। সওয়া এগারোটা নাগাদ দেখা গেল মেরেকেটে শ-খানেক লোক এবং শ’দুয়েক সাংবাদিক রামলীলায় জড়ো হয়েছেন।

(এই সময়, ১৩/০৩/১৪)

ভোটের ব্যবধান বাড়ালে পুরস্কার, না - হলে বহিষ্কার। রাজনীতিতে সেলসম্যানদের প্রথা চালু করছেন তৃণমূলের বিতর্কিত নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট। পুরস্কার মিলবে নগদে। যে ব্লক বা পুর এলাকা বেশি ভোট পাইয়ে দিতে পারবে প্রার্থীকে, সেখানকার সভাপতি পাবেন ৫ লক্ষ টাকা। গ্রাম স্তরে তেমন সাফল্য এনে দিলে অঞ্চল সভাপতির বরাতে মিলবে ১ লক্ষ টাকা। আর কাজে অসফল হলে সোজাসুজি দরজা দেখিয়ে দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার সভাপতিকে। দল থেকে সরানো না-হলেও পদ যাবে নির্ঘাত। রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বুধবার দলে এমন পুরস্কার - তিরস্কারের নীতি ঘোষণা তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি। ভাষণ দিতে উঠে প্রথমেই তিনি বলেন, বোলপুর ও বীরভূম দুই কেন্দ্রেই তৃণমূল প্রার্থীদের দু’লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জেতাতেই হবে। পরে ব্যবধান বাড়ানোর কারণও ব্যাখ্যা করেন তিনি। দলীয় কর্মীরা বৈঠক থেকে বেরিয়ে জানান, এর পরই আচমকা অনুব্রত বলে ওঠেন, ‘জেলার সমস্ত ব্লক সভাপতিকে বলে দিচ্ছি, ব্যাপক লিড চাই। যদি রেজাল্ট খারাপ হয়, তবে যে ব্লকের রেজাল্ট খারাপ হবে, তাঁকে আর রাখব না। কিন্তু যে ব্লক ভালো লিড দেবে, সেখানকার সভাপতিকে ৫ লক্ষ টাকা প্রাইজ দেব। তার পর তিনি জেলার ৭ জন পুরপ্রধানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘আপনাদের এলাকাতেও ভালো লিড চাই। কম লিড মানব না। যাঁরা ২০১১-তে ১০ হাজার লিড দিয়েছেন, তাঁদের ২০ হাজার লিড দিতে হবে।’ মঞ্চে বসে থাকা নেতারা তখন চিৎকার করে বলেন, ‘এদের পুরস্কার দেবেন না?’

(এই সময়, ১৩/০৩/১৪)

গোরু পাচারের ব্যবসায় এসেছেন বছর দশেক। তার মধ্যেই সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০০ কোটি। সোনা পাচারের দায়ে গ্রেপ্তার আব্দুল বারিক বিশ্বাস ডি আর আই কর্তাদের ভাষায় ‘বিগ ক্যাচ’। আর উত্তর চব্বিশ পরগনার রাজনীতিতে তার পরিচয় ‘বিগ ম্যান’ হিসেবে। কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তরের কর্তাদের কাছে তার সম্পত্তির পরিমাণ শুনে আব্দুলের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুল্ক দপ্তরের গোয়েন্দারা। কে এই আব্দুল বারিক বিশ্বাস? বসিরহাট থানার সংগ্রামপুরে আব্দুলের বাড়িটিকে প্রাসাদ বলাই ভালো। ২০০৪ সালের আগে পর্যন্ত এলাকার লোকে তাকে জানত গোরু ব্যবসায়ী হিসেবে। কিন্তু ২০০৫ সাল থেকে গোরু পাচারের ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পসার এবং পয়সা দুটোই বেড়ে চলে আব্দুলের। প্রথমদিকে কংগ্রেসের সাথে যুক্ত থাকলেও ২০০৯-এ লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে হাওয়া বুঝে তৃণমূলে নাম লেখান আব্দুল। তখন থেকেই সীমান্তে গরু পাচারের তিনি একচ্ছত্র সম্রাট। বহুবার তাঁর বিরুদ্ধে নারী পাচারের অভিযোগও উঠেছে। কিন্তু শাসকদলের হাত মাথায় থাকায় পুলিশ বা প্রশাসন কেউই ঘাঁটাতে সাহস পায়নি আব্দুলকে। গত পাঁচ বছর ধরে বসিরহাট তৃণমূলের ছোট বা বড় সভা মানেই মঞ্চ আলো করে বসে থাকতে দেখা যেত এই নেতাকে। সংগ্রামপুরের বাড়িতে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। জেলার রাজনৈতিক মহলের খবর, দলের ঘনিষ্ঠ মহলে আব্দুল গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের প্রার্থী হওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু দল তাকে বঞ্চিত করলেও সংগ্রামপুর আসনে ভাই গোলাম বিশ্বাস টিকিট পান। ওই আসন থেকে জিতে গোলাম এখন তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য। তবে শুধু ভাইয়ের আসনেই বাসনা পূর্ণ হয়নি তাঁর। তৃণমূল সূত্রের খবর, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্রে দাঁড়ানোর জন্য তৃণমূলের কাছে আবদার করেছিলেন আব্দুল। তৃণমূলের এক জেলা নেতার কথায়, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় রায়দিঘির বিধায়ক অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়ের সঙ্গে এলাকায় প্রচারেও নেমেছিলেন আব্দুল। যদিও রবিবার দেবশ্রী জানান, ‘আমি ওই নামে কাউকে চিনি না। অনেকেই তো প্রচারের সময় পাশে থাকে।’ □

(এই সময়, ১০/০৩/১৪)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশীষ রায়, মানস কুমার বড়ুয়া

ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

আসীন হওয়ার পর বাজারের দর-দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ‘মনিটরিং কমিটি’ গড়েছিলেন। মহাকরণ সূত্রে খবর সেই কমিটির একটিও বৈঠক হয়নি। ৩১ অক্টোবর ২০১৩ মুখ্যমন্ত্রী যখন ঘোষণা করছেন ১৩ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করতে হবে খুচরো বাজারে—ঠিক তার আগের পরিস্থিতিটা একটু দেখে নিলে বোঝা যাবে, এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির পিছনে কাদের ভূমিকা রয়েছে?

আমরা দেখলাম শারদোৎসবের সময়কালে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও জ্যোতি আলু ৮-১০ টাকা প্রতি কেজি বিক্রি হয়েছে। কোনও কারণ ছাড়াই হঠাৎ আলুর দাম চড়চড়িয়ে উঠে গেল। সরকারী তথ্য বলছে প্রতিদিন শহর ও শহরতলিতে মিলিয়ে কলকাতায় দৈনিক আলুর চাহিদা ২৪০০ মেট্রিকটন। সেই সময় সরকারী হিসাব বলছে ১৬ লক্ষ মেট্রিকটন আলু হিমঘরে মজুত ছিল। তাতে দু’মাসের চাহিদা এবং বীজ সংগ্রহ করেও ৩ লক্ষ মেট্রিকটন আলু উদ্বৃত্ত হওয়ার কথা। এর থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হিমঘর মালিক-আড়তদার-পাইকারদের কারসাজিতেই এই সঙ্কট।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার কৃষি বিপণন মন্ত্রীকে (অরূপ রায়) দপ্তর বিহীন মন্ত্রীতে পরিণত করে ৮-১০ টাকার আলুকে ১৩ টাকা সরকারি দরে তুলে দিলেন। যা আর নামবে না। অথচ তিনি ঘোষণা করেছিলেন ৭ নভেম্বর ২০১৩-এর সাংবাদিক বৈঠকে—কয়েকজন আড়তদার, পাইকার কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে দাম বাড়িয়ে মুনাফা করছে। তারা গা-ঢাকা দিয়েছে ঘাটশিলা বা জলন্ধরে। পুলিশকে তিনি তাদের ধরে আনতে বলেছেন।

অথচ দেখা গেল, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার পোস্তা বাজারে মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত হয়ে অনিয়ন অ্যান্ড পটাটো হোলসেলার্স অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্টের নাম ধরে (গুরুপদ সিংহ) বলে ফেললেন—তিন দিন বাজারে আলু ছিল না। ও (গুরুপদ) ঘাটশিলায় পালিয়ে গিয়েছিল। ও লাভ করেছে, আমি তিন দিন ওকে লোকসান করাবো। এই নাম ধরে প্রকাশ্য মঞ্চে সম্বোধন করার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় ওদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক কতটা গভীর। যাকে পুলিশ খুঁজছে, সে ওই উদ্বোধন মঞ্চের সামনের সারিতে বসে তা উপভোগ করছে। অর্থাৎ এটা গট-আপ গেম ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর আরও কিছু বিষয় আমাদের সামনে এখন জলের মতো পরিষ্কার। সরকারী ব্যবস্থায় যে আলু ১৩ টাকা দরে বাজারে এলো তা সরকারী কোষাগার থেকে ভর্তুকি দিয়ে—অর্থাৎ জনগণের টাকা বিলি হয়ে গেল ব্যবসায়ীদের কাছে। অথচ যখন আলুর মূল্য চাষিরা পাচ্ছিল না—তারা বিনিয়োগের কোনো ফেরত লাভ পায়নি। তখন সরকার তাদের কোনো ভর্তুকি দেয়নি। ক্ষেতেই নষ্ট হয়েছে এবং অভাবী মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে কৃষক।

সরকারী ব্যবস্থায় ১৩ টাকা কিলো দরে বাজারে কিছু ভালো আলু এলেও ক্রেতাকে বাছাই করার কোনো সুযোগ না দিয়ে দেড় কিলো আলু প্যাকেট বন্দি করে ২০ টাকায় (জ্যোতি আলু) কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হতে দেখা গেল। আশ্চর্যের বিষয় সেই প্যাকেট বন্দি আলুর ১ কেজি পরিমাণটা ভালো। বাকিটা খাওয়ার অযোগ্য। হিমঘরে অধিক সময় ধরে মজুত রাখার ফলে নষ্ট হতে শুরু করা আলু এইভাবে সাধারণ মানুষকে কিনতে বাধ্য করা হল। আসলে ২০ টাকা কিলো দরেই বিকোলো সেই আলু। আলুর দামে ১৩ টাকা কিলো শীলমোহর লাগিয়ে নিয়ে এখন সেই ২০ টাকা কিলো দরেই আলু কিনছেন সাধারণ মানুষ। সরকার এখন চুপ। এবার ভাবুন কোন আঁতাতের পরিণতিতে আলুর এই মূল্য বৃদ্ধি? এইভাবেই কোনো না কোনো খেলা রয়েছে সামগ্রিক মূল্য বৃদ্ধির পিছনে।

জিনিসপত্রের এই মূল্য বৃদ্ধির দায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কেউ এড়াতে পারে না। এই নীতির অনুসরণ কেবল কংগ্রেস চালিত ইউপিএ সরকারই নয়, বিজেপি চালিত এনডিএ এবং রাজ্যের বর্তমান তৃণমূল সরকার, এই দুই কেন্দ্রীয় সরকারের শরিক থেকে এই আর্থিক নীতিকে সমর্থন করে এসেছে এবং এখন তাকেই আরো ত্বরান্বিত করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে দু-একবার লোক দেখানো বাজার পরিদর্শন করে সেই সব লোকেদের নিয়েই টাস্কফোর্স গড়ে দিয়ে আইওয়াশ করছে—যারা কিনা বাজারে যোগানের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করে দাম বাড়িয়ে মুনাফা লোটে। বাজারের যোগান ব্যবস্থায় সরকারী মহলেই স্বীকৃতি যে, কৃষক ও খুচরো ব্যবসায়ীর মধ্যে যোগানের লাগাম ধরা থাকে ‘ফড়ে’দের হাতে। তারাই বাজার নিয়ন্ত্রিক, আবার তারাই টাস্কফোর্সের অন্তর্গত বা তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে টাস্কফোর্স।

এমনভাবে বাজার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে যে ফসল ফলিয়ে চাষের খরচ উঠছে না। বাধ্য হয়ে কৃষক মুক্ত বাজারের দরে ফসল বেচতে বাধ্য হচ্ছেন। লঙ্কা, টমেটো, শশা, আলু থেকে ধান পর্যন্ত সব ফসলই মাঝে মাঝে মাঠেই নষ্ট করে ফেলতে হচ্ছে—কিন্তু সাধারণ ক্রেতা যখন বাজার থেকে তা কিনছে তখন বেশি দামেই তা কিনতে হচ্ছে। অর্থাৎ অসাধু ব্যবসায়ীরা বাজারের যোগান নিয়ন্ত্রণ করছে এভাবেই—সরকারের নীরব ভূমিকা। কৃষক তার ফসল উৎপাদনে আরও কিছু কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে—যেমন চাষের জল। প্রতি মাসে ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে, ফলে সেচের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবহন খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণে। কীটনাশকের মূল্যও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। এই বাজারটিও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বহুজাতিক সংস্থার দ্বারা।

কৃষি নির্ভর ভারতবর্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম যেভাবে উর্দ্ধমুখী হচ্ছে তাকে প্রতিহত করতে হলে জনমুখী ভাবনায় নীতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তা নাহলে এই সঙ্কট আরও তীব্র আকার ধারণ করবে। প্রয়োজনে বিকল্প নীতির দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রের সরকার। নেতা নয়, প্রয়োজন নীতির পরিবর্তন। □

সুগত দাস, মানস কুমার বড়ুয়া

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
42nd Year 11th Issue, March 2014

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

নতুন গ্রাহক বর্ষের আহ্বান

প্রতিবাদ প্রতিরোধের আগুন জ্বালুক সংগ্রামী হাতিয়ার

আজও অতন্দ্র সংগ্রামী হাতিয়ার। ১৯৭১ সালের ৭ মে ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল "আজ সারা পশ্চিমবাংলায় এক আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য শাসকশ্রেণী মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা উন্মাদ হয়ে উঠেছে লক্ষ কোটি মেহনতী মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার জন্য কিন্তু পারছে না।

ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায়, অফিস-দপ্তরে, পাড়ায় পাড়ায় এগিয়ে আসছে মানুষ সীমাহীন ঘৃণা আর জ্বলন্ত বিক্ষোভ বুকে নিয়ে।

—শহীদের রক্তে কঠিন সংগ্রামের দৃপ্ত শপথ উচ্চারিত হচ্ছে দিকে দিকে।...

কঠিন লড়াই লড়বে মানুষ। লড়বে রাজ্য সরকারী কর্মচারী। ...

... এই যুগসন্ধিক্ষণে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সুকঠিন লড়াইকে সংগঠিত করার ও এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল 'সংগ্রামী হাতিয়ার'—রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মাসিক মুখপত্র।... নতুন পর্যায়ের আন্দোলনের বলিষ্ঠ আহ্বান বুকে নিয়ে শুরু হল বন্ধুর, পথে যাত্রা।" সেই যাত্রায় আজও ক্লান্তিহীন সংগ্রামী হাতিয়ার।

যদিও প্রশাসনের অভ্যন্তরে সেদিনের সেই কর্মচারীরা আজ আর নেই, কর্মচারী আন্দোলনের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের সাক্ষী হয়ে এসেছে অগণিত নতুন নতুন মুখ, কালের নিয়মে প্রবীণ ও অভিজ্ঞদের হাত থেকে সংগঠনের পতাকা কাঁধে তুলে নিতে হাজির হয়েছে নবীনরা। অনাগত সময়ের অভিমুখে স্বাধীনোত্তর কর্মচারী আন্দোলনের বহমান স্রোতাধারা থেকে অভিজ্ঞতার নির্যাস নিয়ে সম্মিলিত প্রজ্ঞায় আলোকবর্তিকার মতো 'সংগ্রামী হাতিয়ার' শঙ্কাহীন দাঁড়িয়েছে কঠিন লড়াইয়ের ঘনতমসাচ্ছন্ন আদিগন্ত প্রান্তরে। ঝঞ্ঝার পিঠে সে বার্তা পাঠিয়েছে সংশয়ীর কাছে, দ্বিধান্বিতের কাছে—'আমরা যারা পাথরকেও দিয়েছি উত্তাপ, হয়েছি / ইস্পাতদৃঢ়, নিয়মানুবর্তিতা মেনেছি কঠোর / ভালোবাসাকেই করেছি একমাত্র প্রাণের সম্বল! / আমরা তো জানতামই রক্ত ঝরাতে হবে! / আকাশের তারারও যখন ভাঙন লাগে, বিষন্ন অশান্ত হয় চাঁদের গ্রহণ-লাগা দেখে / তখন কি তোমরা একবার ভাববে আমরা কারা, আমরা কি? / আমাদের ভাবনাকেই চিনবে, জানবে কি হতে চাইছি আমরা?"

* * * *

আজ আবার বাতাসে কটু গন্ধ, রক্ত-মাংসের দলা ইতস্তত, না ফোটা ফুলের পাপড়ি রক্তে মাখামাখি, চেনা বন্ধুর চোখে ধূর্ত লোভ খেলা করে—এইসব দেখে বমনেচ্ছা জাগে। আর তখনই 'সংগ্রামী হাতিয়ার' ডাক দেয় বিহ্বলতা কাটিয়ে শির টান করে দাঁড়াবার জন্য। বলে—"সহায় সম্বলহীন, তোমারও তূনীরে রয়েছে বাণ, এই ক্রুর সময়কে ভেদ করার জন্য। বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতবর্ষ প্রত্যেক নাগরিককে দিয়েছে একটি ভোটের অধিকার, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জাত-ধর্ম নির্বিশেষে। চাইলে এক-একটি ভোট এক-একটি অস্ত্র হতে পারে।"—'একের হাত পারে না শিকল-কারা ছিঁড়তে / দুইয়ের হাত পারে না শিকল-কারা ছিঁড়তে / কিন্তু লাখো লাখো দুটি হাত মিললে এক সাথ আমরা দেখব সেদিন আসছে।'

* * * *

এ কোন গণতন্ত্র? এ কোন স্বদেশ? নির্বাচনের অধিকারের যে সমতা এই দেশ প্রদান করে প্রত্যেক নাগরিককে, সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে, সম্পদের বণ্টনে বিপুল বৈষম্য সেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে ভঙ্গুর করে তোলে ভেতর থেকে। কেন?

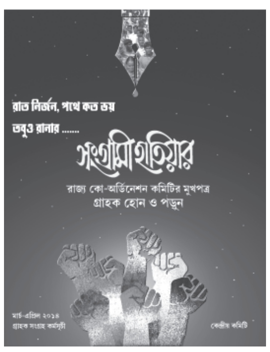

চঞ্চল তিত্‌লির মতো শৈশব কাঁটযুদ্ধ গোলাপ মুঠোয় ধরে শহরের ব্যস্ত ভিড় ঠেলে এসে বলে 'ফুল কিনবে বাবু?' রোদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার শৈশব হাঁটুমুড়ে বসে জুতো পালিশ করে, রেস্টোর‍্যান্টে কাপ-প্লেট ধোয়, আরও কঠিন বিপজ্জনক কাজ করে—ইঁটভাটায় ইঁট বওয়া, পাথর খাদানে পাথর ভাঙা, সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া, নানারকম ধাতুর কাজ করা, এমন হাজারো কাজ। এরা অনেকে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েই জন্মায়, বড় হয়, দালালচক্রের হাতে পড়ে পাচার হয়ে যায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। এরা আধুনিক ভারতের আধুনিক ক্রীতদাস। না-মানুষের জীবনযাপন করতে করতে এদের কারুর কারুর মনের ভিতর মানবিক অনুভূতিগুলো এমন ভোঁতা হয়ে যায় যে একদিন হঠাৎ গরল ঢেলে দেয় সভ্যসমাজের বুকে। দিল্লীর 'নির্ভয়া'র বীভৎস স্মৃতির সঙ্গে, আরও অজস্র ধর্ষণ-নির্যাতনের সঙ্গে এমন করে জড়িয়ে যায় কোনো কোনো নাবালকের নাম। এর কোনো প্রতিকার নেই? এদের রক্ত নিংড়ে বড়লোকদের মুনাফা চলতে থাকবে? এদের মুখের গ্রাস কেড়ে জীবনের অধিকার কেড়ে বড়লোকদের করের টাকায় ছাড় দেওয়া হবে?

ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট গত বছর অক্টোবরে সর্বশেষ যে ক্ষুধাসূচক প্রকাশ করেছে তাতে এদেশে ক্ষুধিতের সংখ্যা দেখিয়েছে ২১ কোটি। সারা বিশ্বের প্রতি চারজন ক্ষুধিত মানুষের একজন ভারতীয়। সাব-সাহারান দেশগুলি বাদ দিলে শুধু হাইতি আর তিমোর-লেস্তে ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো দেশের অবস্থা এত খারাপ নয়, এমনকি পাকিস্তান বা বাংলাদেশও না। তাহলে গণবণ্টন ব্যবস্থা সরকার ধ্বংস করল কেন, কাদের স্বার্থে? খাদ্য নিরাপত্তা বিল যে পাশ হল এত ঢাকঢোল পিটিয়ে তার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো রে রে করে তেড়ে আসছে কেন? খাদ্যশস্যের বাণিজ্যে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর স্বার্থে দেশের মানুষের খাদ্যের অধিকার জলাঞ্জলি দেওয়া চলতেই থাকবে? আর সরকারী হিসাবে গরিবকে কি করে গরিব না দেখানো যায় সেই কৌশল চলতেই থাকবে? এর পাশাপাশি ৫ হাজার কোটি টাকার ওপর সম্পদ নিয়ে ১২২ জন পুঁজিপতির বিলাসপ্রমত্ত জীবন অশ্লীল মনে হবে না! এর বিরুদ্ধে লড়াই কে করবে?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট বলছে পৃথিবীর ২৬ শতাংশ যক্ষ্মা রোগীর বাস ভারতবর্ষে। ৯.৩ লক্ষ যক্ষ্মারোগীর রোগনির্ণয় পর্যন্ত হয়নি। ফলে যক্ষ্মা মহামারীর আকার নিয়েছে। অথচ যক্ষ্মা নিরাময়যোগ্য একটি রোগ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের তথ্য ইঙ্গিত দিচ্ছে স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারীকরণের ফলে অবহেলিত হয়েছে রোগপ্রতিরোধের ব্যবস্থা। মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবে না?

সারা দেশে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা ১৯৯৫ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৯৪। পৃথিবীর কোনো একটি পেশার সঙ্গে যুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এত আত্মহত্যার ঘটনা কখনও ঘটেনি। সরকার নামমাত্র ঋণ মকুব করলে কর্পোরেটরা হুলুস্থুল বাঁধাবে কেন? শ্রমিকের অধিকার হরণ হচ্ছে সর্বত্র। দেশের প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসাবে আবহন করছেন পশু শক্তিকে, সারা দেশের শ্রমিকের মেরুদণ্ড যাতে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়। মানেসরের মারুতি সুজুকি কোম্পানির ২০০০-এর ওপর ছাঁটাই হওয়া শ্রমিক আর কারাগারে নিক্ষিপ্ত তাদের ১৮৪ জন সহযোদ্ধার লড়াই, তাদের পরিবারের লড়াই জানিয়ে দিচ্ছে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে দমন করা যায় না কোনো কায়দাতেই। সংগ্রামী হাতিয়ার সারা বিশ্বের চলমান ঘটনাপুঞ্জ থেকে মেহনতী মানুষের লড়াই আন্দোলনের কথা তুলে এনে শিক্ষা দেয়—মানুষই শেষ বিচারে জয়ী হয়, পশুশক্তি নয়।

কিন্তু মানুষের এই ক্ষোভ-ক্রোধকে কাজে লাগাতে চাইছে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি আর তাদের সমর্থনে নেমে পড়েছে সেই একই নব্য উদারনীতির হাঙরের দল কর্পোরেটরা। এই দানবীয় শক্তি কোন বিপজ্জনক পথে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে এদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাকে?

সংগ্রামী হাতিয়ার বলছে, 'এইসব অন্যায়ের কথা অবিচারের কথা বঞ্চনার কথা কর্মচারীদের কাছে, মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। বল, গরিবের রক্তচোষার উদার অর্থনীতি আর চাই না। বিকল্পের দাবি কর। বল, সবার জন্য খাদ্য চাই, বাসস্থান চাই, শিক্ষা চাই, বয়স্ক-দুঃস্থ-অসহায়দের সামাজিক সুরক্ষা চাই। সাম্প্রদায়িক হানাহানি রোধ করতে চাই। বল, স্বদেশের অপমান ঘোচাতে চাই।

ঘৃণার আগুন, ক্ষোভের আগুন ঘোচাতে চাই। ধিকি ধিকি করে জ্বলছে এরাজ্যে কর্মসংস্থানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত লক্ষ লক্ষ বেকার, শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের শিকার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ছাত্রসমাজ, আর্থিক বঞ্চনার শিকার শ্রমিক-কর্মচারী, সারদা থেকে টেট একটার পর একটা কেলেঙ্কারিতে ক্ষতিগ্রস্ত অসংখ্য মানুষ, প্রতিদিন অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার নারীদের মনে। তাদের সবাইকে ঘরে ঘরে গিয়ে বল—'সাময়িক অসময়, আঁধি, চোখকে করে না অন্ধ / দেশের কারণে যদি মৃত্যুও হয় / জেনো সে মরণে চেনা কোনো সন্তাপ থাকবে না।'

* * * *

অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভয়হীন প্রচারক সংগ্রামী হাতিয়ার, শ্রেণীর মতাদর্শ প্রচারে সে মানুষের শিক্ষক, মানুষকে প্রতিবাদে প্রতিরোধ প্রবৃত্ত করানোর কাজে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক। তাই 'সংগ্রামী হাতিয়ার'কে ওদের ভয়। তাই দপ্তরে দপ্তরে কর্মচারীদের টেবিলে 'সংগ্রামী হাতিয়ার' পৌঁছে গেলে নখরদন্ত বার করে কখনও হঠাৎ আক্রমণ ঝাঁপিয়ে পড়ে হায়নার দল কখনও জারি করে নিষেধাজ্ঞা। কারণ ওরা ভালো করেই জানে হয়তো সমাজের গণমান্য অনেক ব্যক্তিই অর্থলোভে, যশলোভে, পদলোভে হন্তারক-ধর্ষক-নিপীড়কদের স্তাবকতা করতে পারেন কিন্তু কোনো সৎ, আদর্শনিষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে কাঞ্চনমূল্যে কেনা যায় না, কেনা যায় না 'সংগ্রামী হাতিয়ার'-এর মতো মুখপত্রকেও। দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি ঐ বিশ্বাসঘাতকদের জন্য ঘৃণায় 'সংগ্রামী হাতিয়ার' বলে ওঠে 'ওরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না / মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভানে / কেন চেয়ে আজ গো মা?"

* * * *

এই সংগ্রামী হাতিয়ার আমাদের কণ্ঠস্বর, আমাদের গর্বের মুখপত্রকে আরও শক্তিশালী আয়ুধে পরিণত করে তুলতে পারি আমরাই—যদি লক্ষ লক্ষ মানুষের হাতে তুলে দিতে পারি। যাতে লক্ষ মনে লক্ষ প্রাণে ছড়িয়ে পড়ে সংগ্রামী হাতিয়ারের বার্তা। প্রতিবাদের প্রতিরোধের আগুনে শত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্নভিন্ন করে এগিয়ে চলুক সংগ্রামী হাতিয়ার। সংগ্রামী হাতিয়ার জেগে থাক, জাগরণের গানের প্রতীক্ষায়। □

শাশ্বতী মজুমদার

পিপল্‌স্‌ রিলিফ কমিটিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান

পি আর সি-র সভাপতি ডঃ সুবীর দত্ত-র হাতে এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন মনোজ কান্তি গুহ।

দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষের কাছে সুলভে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার যে কাজ ধারাবাহিভাবে পিপল্‌স্‌ রিলিফ কমিটি করে আসছে তার পাশে আরও একবার দাঁড়ালো রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। ১৫ মার্চ, ২০১৪ সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে পি আর সি-র সভাপতি ডঃ সুবীর দত্ত-র হাতে এক লক্ষ টাকার একটি চেক তুলে দেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। উল্লেখ্য সংগঠনের রাজ্য কাউন্সিল সভা চলাকালীন এই উপলক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন মনোজ কান্তি গুহ এবং ডঃ সুবীর দত্ত। পি আর সি-র পক্ষ থেকে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক রাধারমন দাঁ। অতীতেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে একাধিকবার পি আর সি-কে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে আরও ঘোষণা করা হয়, উত্তর দিনাজপুরের একজন কর্মচারীও পি আর সি-কে এক লক্ষ টাকা সাহায্য করবেন বলে জানিয়েছেন। ডঃ সুবীর দত্ত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে এই সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানান। □

যৌথ আন্দোলনের দাবিসমূহ

● ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অর্জিত অধিকার হরণ করা চলবে না। ● রাজ্য সরকারী এবং পঞ্চায়েত, বোর্ড ও কর্পোরেশন সহ সর্বস্তরের বিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মচারী ও শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের কেন্দ্রীয় হারে প্রাপ্য দিন থেকে বকেয়াসহ মহার্ঘভাতা দিতে হবে। বকেয়া ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে দিতে হবে। ● নবান্ন, খাদ্যভবনসহ অন্যান্য সরকারী দপ্তরে আন্দোলনের অধিকার হরণকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সার্ভিস রুলস ও ক্যাডার রুলস সংশোধনীসহ সকল কালা আদেশনামা বাতিল করতে হবে। ● হয়রানিমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বদলি রদ এবং সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভিসন্ধিমূলক বদলির আদেশনামা বাতিল করে পূর্ববর্তী স্থানে ফিরিয়ে দিতে হবে। ● পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের (অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটি) অবশিষ্ট কর্মচারী স্বার্থবাহী সুপারিশসমূহ দ্রুত কার্যকর করতে হবে। ● স্থায়ী পদ অবলুপ্তির প্রক্রিয়া বন্ধ করে প্রশাসনের সর্বস্তরের শূন্যপদসমূহ পি এস সি-র মাধ্যমে পূরণ এবং নিয়মিত নিয়োগের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। ● চাকরীরত অবস্থায় মৃত / অক্ষম কর্মচারীর পোষ্যের চাকরির সংশোধিত আদেশনামা বাতিল করতে হবে। ● সমস্ত ধরনের অনিয়মিত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ এবং ওয়ার্ক-চার্জড কর্মচারীদের (১০ বছরের বেশী চাকুরি) নিয়মিতকরণ করতে হবে। ● হেলথ স্কীম সম্পূর্ণভাবে ক্যাশলেস করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

(ফর্ম নং-৪, রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

প্রকাশকের নাম	ঃ	অজয় মুখোপাধ্যায়
জাতি ও ঠিকানা	ঃ	ভারতীয়, ১০এ, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪
মুদ্রকের নাম	ঃ	ঐ
জাতি ও ঠিকানা	ঃ	ঐ
প্রকাশের কাল	ঃ	মাসিক
সম্পাদকের নাম	ঃ	সুমিত ভট্টাচার্য
জাতি ও ঠিকানা	ঃ	ভারতীয়, ১০এ, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪
স্বত্বাধিকারী	ঃ	পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, ১০এ, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪

আমি, শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায়, ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লিখিত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

তারিখ ঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ স্বাঃ অজয় মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।